শাইখ আলী তানতাবী

দামেশকের শরীয়া কোর্টের বিচারপতি হিসেবে
বিশ হাজারের মতো বৈবাহিক জটিলতা নিরসনের
দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা

অনুবাদক পরিচিতি

নাম : মুহাম্মাদ আইনুল হক কাসিমী
পিতা : মাওলানা শফিকুল হক এলাকার সর্বমহলে পরিচিত একজন আলেম ও বুজুর্গ।

জন্ম : বাংলাদেশের সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারা বিধৌত জকিগঞ্জ থানাধীন পৌরসভার বর্ণালী আ/এ কেছরীতে ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবরে একটি প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারে। পাঁচ ভাই-বোনের মাঝে তৃতীয়।

লেখাপড়া : প্রথমে জকিগঞ্জ সদর সংলগ্ন জামি'আ ইসলামিয়া ছায়ীদিয়া মাইজকান্দিতে, অতঃপর সিলেটের শীর্ষ ইসলামি বিদ্যাপীঠ, খলীফায়ে মাদানি হযরত আল্লামা বদরে আলম শাইখে রেঙ্গা রহ. এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী জামি'আ তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা, দক্ষিণ সুরমায় লেখাপড়া করে ২০১২ সনে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সমাপন। এরপর আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রাম থেকে আত-তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস ও সর্বশেষ উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পুণঃ দাওরায়ে হাদিস।

শিক্ষকতা : প্রথমে সিলেট শহরস্থ জামি'আ মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সোবহানীঘাটে। বর্তমানে জামি'আ ফারুক্বিয়া ক্বাওমিয়া নানাখী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার সিনিয়র মুহাদ্দিস।

লেখকের অনূদিত বই :

* যুবকদের বাঁচাও
* বিয়ে নিয়ে কিছু কথা

লেখকের রচিত পরবর্তী বই :

* ওসমানী খিলাফাহর স্বর্ণকণিকা
* ওসমানী খিলাফাহর সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত
* ওসমানীদের আঁখিজল বীরগাঁথা কাহিনী ও ত্যাগের নজরানা

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা

قال صلى الله عليه وسلم

في خديجة

رضي الله عنها

رواه مسلم

শাইখ আলী তানতাবী

আইনুল হক কাসিমী অনূদিত

সূচি

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা ৫
বিয়েকে সহজকরণ ১৬
বিয়ের জটিলতা ২৯
জটিলতার কারণ ৪০
ভালোবাসা ও বিয়ে ৫২
ভালোবাসার বিয়ে ৬২
বিয়ের উপযুক্ত বয়স ৬৭
আমার বিয়ে ও বধূ- ৭৪

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা
(১৯৫৯ সালে প্রকাশিত)

দু-দিন আগে আমাদের নিকটাত্মীয় এক যুবক আমার সাথে দেখা করল। উচ্চশিক্ষিত সে। অনেক সম্মান-প্রতিপত্তি তার। সুন্দর চরিত্র ও দৈহিক গঠনের অধিকারী। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। কিন্তু এখনো বিয়ে করেনি। তাকে বললাম :

-তুমি বিয়ে করছ না কেন?

-আমার পরিচিত সব বিবাহিত ভাইদের পেয়েছি যে সবাই বৈবাহিক জীবনে অশান্তি, কলহ, ঝগড়া-বিবাদের অভিযোগ করছে। তারা বৈবাহিক জীবনের নানা কষ্ট সহ্য করে চলেছে। বিয়েটা তাদের জীবনে খাদ্যনালিতে আটকে যাওয়া খাবার হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা আরজু ব্যক্ত করছে, হায়! যদি তারা আদৌ বিয়ে না করত! তাদের কথায় বুঝলাম যে, এ যুগে বিয়ে করা মানেই মাথাব্যথা ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা। আর আমি পয়সা খরচ করে মাথাব্যথা ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা খরিদ করতে চাই না।

-তোমার যে সকল বিবাহিত বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছ, তারা কি সকলেই মানুষ? তারা কষ্ট ও ব্যথায় আছে বলে কি সব বিবাহিতই এ রকম পরিস্থিতিতে আছে? সব বিয়েই কি মাথাব্যথা ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা? তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? আমি তাদের তুলনায় এ বিষয়ে অধিক অবগত। যে ব্যক্তি পাঁচটা মজলিসে উপস্থিত হয়ে পরস্পর দুই ঝগড়াটে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বৈবাহিক বিবাদ মীমাংসা করে, সে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। আমি আদালতে ত্রিশ হাজারেরও অধিক বার বিচারকের আসনে বসেছি। সেখানে আমি স্বামী-স্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক জবানবন্দি শুনে ফয়সালা করেছি। তা ছাড়া আমি ব্যক্তি-সংশোধন ও সমাজ-পর্যালোচনায় নিয়োজিত একজন ব্যক্তি। যদি আমি বর্তমানে একটি পেশায় নিয়োজিত না হতাম, জনকল্যাণমূলক কাজে ও লেখালেখিতে মশগুল না হতাম, তা হলে পারিবারিক জীবন-পর্যালোচনা নিয়ে একটি অফিস খুলতাম। সেখানে আমি দাম্পত্যজীবনের সব সমস্যার সমাধান করতাম। বলতে গেলে এ বিষয়ে আমি একজন অভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ। সুতরাং তুমি আমাকেই

জিজ্ঞাসা করো।

-আচ্ছা, আপনি কি দেখেন না, অধিকাংশ দম্পতির জীবনে ক্রমাগতভাবে ঝগড়া লেগেই আছে?

-আমি চাই প্রথমে তোমাকে ঝগড়ার সংজ্ঞা বুঝিয়ে দিই। যেহেতু তুমি ও তোমার বন্ধুরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত মতানৈক্য থেকে খালি একটি দাম্পত্যজীবন চাও, এবং এটা চাও যে, পুরো দাম্পত্যজীবনটা হবে বাসর রাত উদ্‌যাপনের মাসের মতো, স্বামী-স্ত্রীর মিলন হবে রোমিও-জুলিয়েটের মতো অথবা লাইলী-মজনুর মতোড়তা একেবারে অসম্ভব। ভালোবাসার মিলনে আর কী হয়, শুধু এই অনর্থক প্রেমালাপ ছাড়া যে, স্ত্রী স্বামীকে বলবে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', আর স্বামী স্ত্রীকে বলবে, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। এভাবে উভয়ে একই কথাকে বার বার বলতে থাকবে, অতঃপর উভয়ে বিরক্ত হয়ে যাবে ও নীরবতা অবলম্বন করবে। পুরো জীবনটা কি এমন হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে শুধু বলবে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'ড়যেভাবে অবুঝ যুবকেরা কল্পনা করে থাকে? যদি মজনু লাইলীকে বিয়ে করত ও তার দাম্পত্যজীবনকে শুধু প্রেমালাপের মাঝেই সীমাবদ্ধ করত, তা হলে বিয়ের দ্বিতীয় মাসের শুরুলগ্ন থেকেই তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত। তৃতীয় মাসে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তাদের কলহ-বিবাদ শুনতে পেত। আর বছর ফুরোনোর আগেই শরীয়া কোর্টে এসে বিবাহবিচ্ছেদের দাবি উঠত।

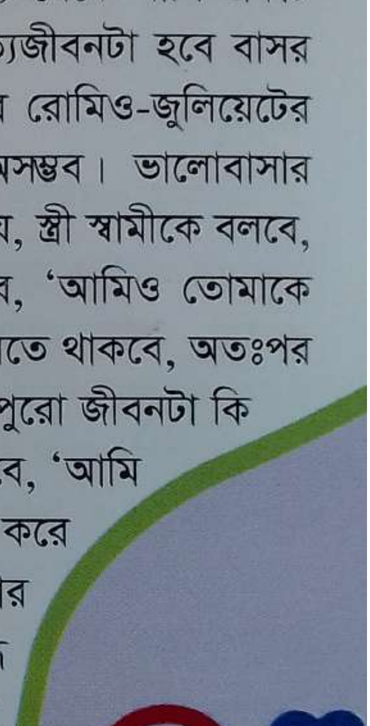

সুতরাং মোটেও সম্ভব নয় যে দুনিয়াতে কোনো স্বামী-স্ত্রী এই ধরনের নিছক কল্পিত জীবনসংসার করে যাবে। এই ধরনের জীবনসংসার কেবল গল্প-উপন্যাসেই স্থান পেতে পারে। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী মাঝেমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকে। একজন আলেমের পরিবারেও এ ধরনের মতবিরোধ হয়ে থাকে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারেও এ রকম নারীকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ হতো।

অথচ তাঁর পরিবার ছিল জগতের শ্রেষ্ঠ পরিবার। স্বয়ং কুরআনুল কারীম দলীল। দেখুন : সূরা আত-তাহরীম। *[সূরা আত-তাহরীম এর প্রথম আয়াতটি হলো : 'হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য নিজের ওপর হারাম সাব্যস্ত করছেন কেন? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'*

আয়াতটি বোঝার জন্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানতে হবে। আর তা হলো–

** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহশ রা. এর কাছে কিছুক্ষণ থাকতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। হাফসা এবং আয়েশা রা. স্বাভাবিকতার অধিক সময় তাঁর সেখানে থাকার পথ বন্ধ করার জন্য ফন্দি আঁটলেন যে তাঁদের কারও কাছে যখন তিনি আসবেন, তখন তাঁরা বলবেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি 'মাগাফীর' খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীর' এর গন্ধ আসছে। (মাগাফীর একপ্রকার গাছের মিষ্ট আঠা, যা খেলে মুখে একপ্রকার গন্ধ সৃষ্টি হয়।) সুতরাং তাঁরা পরিকল্পনা অনুযায়ী তা-ই করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তো যয়নাবের ঘরে কেবল মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনো তা পান করব না। তবে এ কথা তোমরা অন্য কাউকে বোলো না। (বুখারী, সূরা তাহরীমের তাফসীর) সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে যে, তা ছিল একটি ক্রীতদাসী, যাকে তিনি নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন।*

(সুনানে নাসাঈ, ৩/৮৩)

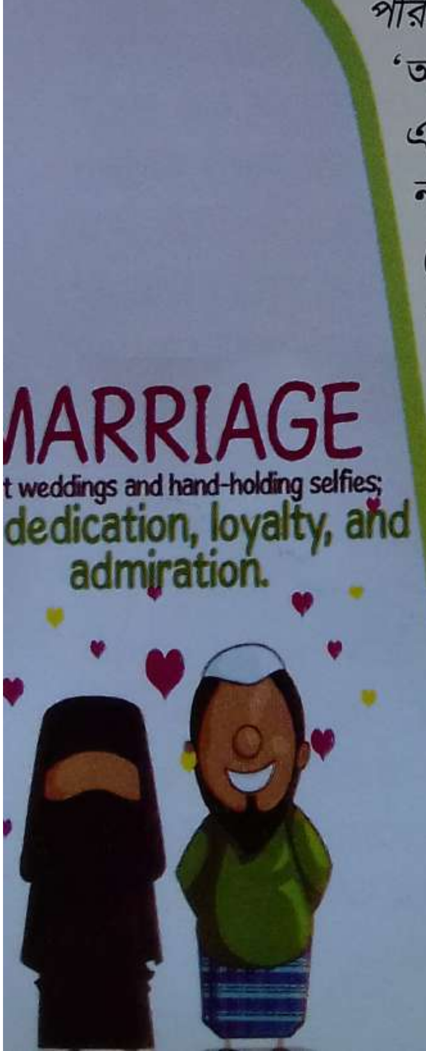

** পক্ষান্তরে কিছু আলেম সুনানে নাসাঈর এ বর্ণনাকে দুর্বল গণ্য করেছেন। এর বিশদ বর্ণনা অন্যান্য কিতাবে এভাবে এসেছে যে, তিনি ছিলেন মারিয়া কিবতিয়া রা., যাঁর গর্ভে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একবার হাফসা রা. এর ঘরে এসেছিলেন। তখন হাফসা রা. ঘরে উপস্থিত ছিলেন না।*

তাঁদের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার) উপস্থিতিতেই হাফসা রা. এসে যান। তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নিজের ঘরে নির্জনে দেখে তিনি অত্যন্ত নাখোশ হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ কথা অনুভব করলেন এবং তিনি হাফসা রা. কে খুশি করার জন্য কসম খেয়ে মারিয়া ক্বিবত্বিয়া রা. কে নিজের ওপর হারাম করে নিলেন। আর হাফসা রা. কে তাকীদ করলেন, তিনি যেন এ কথা অন্য কাউকে না বলেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. প্রথমত বলেন, এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা একে অপরকে বলিষ্ঠ করে। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন, হতে পারে একই সময়ে উভয় ঘটনাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। (ফাতহুল বারী, সূরা তাহরীমের তাফসীর) ইমাম শওকানীও এ কথার সমর্থন করে উভয় ঘটনাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।

* হযরত নু'মান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুতি চাইলেন। এমন সময় তিনি তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা রা. কে শুনতে পেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেই নিজ মেয়ের ওপর চড়াও হলেন। বললেন, 'হে উম্মে রূমানের মেয়ে, তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর গলাবাজি করছ?! অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁদের উভয়ের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন। অতঃপর যখন আবু বকর রা. চলে গেলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রা. কে সন্তুষ্ট করতে বলতে লাগলেন, 'আয়েশা, তুমি কি দেখোনি, কীভাবে আমি তোমার ও তোমার পিতার মাঝখানে পড়ে বিষয়টার সমাধা করলাম?' নু'মান বিন বশীর রা. বলেন, অতঃপর যখন আবু বকর রা. আবার ফিরে আসলেন, ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি দেখতে পেলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রা. এর সাথে মনানন্দে হাসাহাসি করছেন। এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন, তিনি ভেতরে প্রবশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললন, 'হে আল্লাহর

রাসূল, আপনাদের শান্তিচুক্তিতে আমাকেও শামিল করুন যেমনি আপনারা আপনাদের যুদ্ধেও আমাকে শামিল করেছিলেন।' (মুসনাদে আহমাদ)

* একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী হযরত সাফিয়্যাহ রা. ক্রন্দন করছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাফিয়্যাহ বললেন, 'হাফসা আমাকে বলেন, আমি নাকি ইহুদীর মেয়ে! তা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনাস্বরূপ বললেন, 'তুমি বলবে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী, নবী হারূন আ.-এর কন্যা আর নবী মূসা আ. এর ভাতিজি।'

(উসদুল গাবাহ, ৫/৪৯১)

* হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. এর ঘরে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ রা. কোনো এক খাদেমের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি পাত্রে কিছু খাদ্য হাদিয়াস্বরূপ পাঠালেন। তা দেখে আয়েশা রা. খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। পাত্রটি খাদেমের হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। খাদ্যগুলোও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে এসে পাত্রের ভেঙে যাওয়া টুকরাগুলো একত্র করলেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া খাদ্যগুলো ভাঙা পাত্রে রাখলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মাতাকে আত্মসম্মান পেয়ে বসেছে!' অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদেমকে আটকে রেখে আয়েশা রা.-এর ঘর থেকে একটি ভালো পাত্র এনে যয়নাব বিনতে জাহশ রা.-এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন আর ভাঙা পাত্রকে আয়েশা রা. -এর ঘরেই রাখলেন।

(বুখারী, তিরমিযী, আল-মুহাল্লা)

* আর 'ইফক' -এর ঘটনা তো সকলেরই জানা। তদ্রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পুণ্যবতী রমণীগণ আরও বেশি ভরণ-পোষণ চাওয়ার কারণে যে, এক মাস তিনি তাদের ধারে-কাছে যাবেন না বলে শপথ করেছিলেন তাও তো প্রসিদ্ধ।

সুতরাং বোঝা গেল, জগতের শ্রেষ্ঠ পরিবারের মধ্যেও মাঝেমধ্যে নারীকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ হতো।-অনুবাদক]

সাহাবায়ে কিরামও তাঁদের স্ত্রীদের সাথে বাদানুবাদ করতেন। এক ব্যক্তি হযরত ওমর রা. এর কাছে অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো। যখন দরজায় করাঘাত করল, ঘরের ভেতর তাঁর সহধর্মিণীর উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেল। কিন্তু ওমর রা. নিশ্চুপ। অথচ তিনি এমন ওমর, নেতাপর্যায়ের লোকেরা পর্যন্ত তাঁর নাম শুনে কেঁপে উঠত! ইতিমধ্যে লোকটি চলে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন ওমর রা. বেরিয়ে এসে তাকে ডাক দিলেন। যখন লোকটি ফিরে আসলো, ওমর রা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন এসেছিলে?' লোকটি বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন, আমি আমার স্ত্রীর অসদাচরণের অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলাম। আমার স্ত্রী আমার ওপর গলাবাজি করে। এসে দেখলাম আপনিও আমার মতো!' ওমর রা. হেসে বললেন, 'এসব সহ্য করি। কারণ, আমার ওপর তার অধিকার রয়েছে।'

আল্লাহ তা'আলা একই আকৃতি দিয়ে দুটি মানুষকে সৃষ্টি করেননি। এমনকি দুই যমজকেও না। যখন তারা একসাথে দাঁড়ায়, তাদের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা একই রকম স্বভাব-চরিত্র দিয়ে দুজন মানুষকে সৃষ্টি করেননি। যদি দুজন স্বামী-স্ত্রী অথবা দুজন অংশীদার বা দুজন বন্ধু চায় যে, তাদের মাঝে কোনো ধরনের বিরোধ না হোক, তা হলে এটা অবশ্যম্ভাবী যে, তাদের দুজনের এক জনকে অপরের মত সমর্থন করতে হবে নিজের মতের বিরোধিতা করে। প্রত্যেকেই যদি নিজের মতের ওপর অটল থাকে, তা হলে আদৌ উভয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। আপনি যদি রাস্তার ডান পাশে থাকেন আর আপনার বন্ধু বাম পাশে এবং আপনি তার সাথে মোসাফাহা করতে চান, তা হলে একজনকে রাস্তা পার হয়ে আসতে হবে; না হয় দুজনকে দু-পাশ থেকে এগিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে খালি জায়গায় এসে মিলিত হতে হবে।

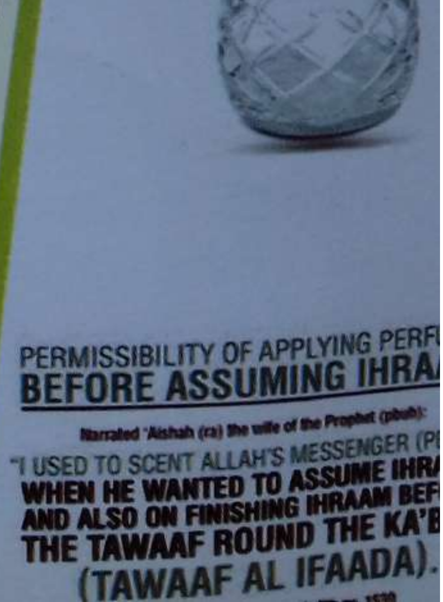

প্রত্যেক অংশীদারি কাজে একজন নীতিনির্ধারক হর্তাকর্তা থাকা জরুরি। আর দাম্পত্যজীবনের নীতিনির্ধারক হর্তাকর্তা অবশ্যই স্বামী হবেন।

সুতরাং দাম্পত্যজীবনের যেকোনো ব্যাপারে তার মতের অগ্রাধিকার থাকবে। তবে প্রত্যেক ছোট-বড় বিষয়ে তার কর্তৃত্ব চলবে না। ঘর ঝাড়ু দেয়া, খাবার পাকানো, ঘর-দোর গোছানো ইত্যাদি বিষয়ে নাক গলাতে পারবে না। কেননা, এসব গৃহকর্ত্রীর অধিকার। সে ঘরের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মতো তারও সাধারণ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। এখন যদি স্ত্রী নিজে অপরিচ্ছন্ন থাকে, ঘর-দোর অপরিচ্ছন্ন রাখে, অথবা ভালো রান্নাবান্না করতে না পারে, তা হলে স্বামী তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবে। আর যদি স্ত্রী পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পাগলিনি হয়ে ওঠে যে, খাওয়া- দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, নিজের হক ও স্বামী-সন্তানের হক ভুলে গিয়ে ঘর ও ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সে পরিচ্ছন্নতার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, তার পায়ের আগে তার মাথা আগ বাড়তে থাকে, এখানে ওখানে ঢুঁ মারতে শুরু করে, তা হলে স্বামী তাকে সতর্ক করবে।

বেশির ভাগ পুরুষ ঘরের পরিচ্ছন্নতা, মেঝের চাকচিক্য ও বসার চেয়ারগুলোর সাজানো-গোছানোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। বরং তারা এটা চায় যে, তাদের কেবল একটা জীবনসঙ্গিনী হোক, যে তাদের মতের অনুকূলে মত প্রকাশ করবে। তাদের সাথে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে প্রস্তুত থাকবে।

কিছু মহিলা এমন আছে, এই পরিচ্ছন্নতা তাদের পরিচ্ছন্নতার রোগকে আরও বাড়িয়ে দেয়! তারা এতটাই পরিচ্ছন্নতাপ্রবণ হয়ে ওঠে যে কিছু কামরাকে তারা পরিচ্ছন্ন করার পর শয়তানের জন্য রেখে দেয়। এই কামরাগুলো কেউ ব্যবহার করে না। সে পরিষ্কার করে ঘরের এক কোণে বসে পড়ে। স্বামীকেও ওই কোণে বসে থাকতে বাধ্য করে। যখনি কেউ ওই কামরার পরিপাটিকৃত কোনো আরামদায়ক আসনে বসে পড়ে, সে চিৎকার করে ওঠে এই, এই, উঠো, দাঁড়াও! তুমি এটাকে নোংরা করে ফেললে! দেখছ না আমি সেই সকাল থেকে এগুলো পরিচ্ছন্ন করে আসছি?!

VE IS WHEN.....

lah ﷺ said the superiority of
ther women is like the superiority
areed over other dishes.

অনেক সময় সে নিচে মাদুরে শুয়ে পড়ে, যাতে শোবার খাট সাজানো-পরিপাটি থাকে। ওথচ এই খাটকে দেখার জন্য কেউ আগমন করে না বা খাটকে কোনো মেলায় প্রদর্শন করা হয় না।

জ্ঞানী নারী সে, যে সব সময় স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশে করতে থাকে অতঃপর তা সম্পাদন করে। ঠিক পুরুষের জন্যও উচিত, স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও মনানন্দকে খুঁজে বেড়ানো। নিজের কর্তৃত্বের প্রবঞ্চনার শিকার হওয়া উচিত নয়। নিজেকে এমনভাবে পারস্যসম্রাট নওশেরওঁয়া ভাবা ঠিক নয় যে আদেশ-নিষেধ করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। নিজের বিচক্ষণতা ও সহমর্মিতা শুধু বাইরের লোকদের জন্য হওয়া ঠিক নয়। কেননা, মানুষ সে নয়, যার কল্যাণ শুধু বাইরের লোকদের জন্য আর মন্দ ঘরের লোকেদের জন্য।

দামেশকে এক লোক আনকোরা সব কিচ্ছা-কাহিনি একের পর এক বর্ণনা করার ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তীক্ষ্ণ বিষয়াবলি আর আশ্চর্য ঘটনাবলি জানত। লোকটা এতটাই ভাঁড়-প্রকৃতির ছিল যে একমাত্র সন্তানহারা দুঃখিনী মাকেও হাসিয়ে ফেলত! মানুষ তার দাওয়াতে ও তার পাশে জমায়েত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত। লোকেরা তাকে অনুষ্ঠানের শোভা-সৌন্দর্য মনে করত। ওই ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য কারও কথা বলার সুযোগ ছিল না। একটি কথা বলার সাথে সাথে লোকে অন্তরের তলানি থেকে হেসে পড়ে লুটোপুটি খেত!

এতৎসত্ত্বেও এই লোকটাই তার পরিবারের জন্য ছিল এক রাশভারী-গুরুগম্ভীর লোক। ঘরের কারও জন্য মুচকি হাসিটাও দিত না। কারও সাথে কোনো কথা বলত না। । সে ঘরে আগমন করামাত্রই পুরো ঘরে দুশ্চিন্তা আর নীরবতা ছেয়ে যেত! কারও সাথে তো কথা বলতই না, ঘরের কাউকে তার উপস্থিতিতে কথা বলতেও দিত না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন লোককে জানি। সে বিভিন্ন ভ্রমণে বা বিনোদনে বের হলে একাই সব সাথিদের খেদমত আঞ্জাম দেয় । বন্ধুরা সবাই তাঁবুতে থাকলে, সে নিজেই বাজার থেকে গোশত, তরকারি, শাক-সবজি খরিদ করে নিয়ে আসে। আগুন জ্বালায়, সবার জন্য খাবারের আয়োজন করে। একসাথে সবাই আনন্দ-গল্পে মত্ত থাকলে বন্ধুদের জন্য চা-কফি পরিবেশন করে।

তাদের কারও কিছু প্রয়োজন হলে, সে নিজেকে এগিয়ে দেয়। বন্ধুদের সেবায় নিজেকে পেশ করে। কিন্তু নিজের বাড়িতে সে একজন অলস ব্যক্তি। পরিবারের ওপর শাসনের লাঠি ঘোরায়। অযথা তাদের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে রাখে। এটা-ওটা চাপিয়ে দেয়। এক গ্লাস পানিও নিজ হাতে ঢেলে পান করে না। বসার চেয়ারটাও নিজে টেনে আনে না। আলমারি থেকে জামা-কাপড়টাও নিজে আনতে যায় না; বরং তার স্ত্রী বা মেয়েকে তার জন্য গ্লাসে পানি ঢেলে দিতে হয়। চেয়ার টেনে আনতে হয়। আলমারি থেকে জামা-কাপড় এনে দিতে হয়।

আরও এক ব্যক্তিকে আমি চিনি, বন্ধুদের কাছে তার চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। তাদের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠায়। বিভিন্ন অনুদান দেয়। কোনো বিনিময় নেয় না। তাদের ছেড়ে সে নিজে একা কিছু গ্রহণ করে না। অথচ এই লোকটা পরিবারের সবার কাছে সুপরিচিত এক হাড়কিপটে! তার পরিবার-পরিজনকে সামান্য কিছু এনে দিতেও কার্পণ্য দেখায়! আবশ্যক জিনিসপত্র পর্যন্ত এনে দেয় না।

এমন কিছু মহিলাকেও আমি চিনি, যাদের অভ্যর্থনা বা আতিথেয়তার জন্য রাখা হলে তাদের মুখ থেকে একটা শক্ত কথা বা কটুবাক্য প্রকাশ পাবে না। একটি মুহূর্তের জন্যও তাদের মুখ থেকে ভুবনমোহিনী মুচকি হাসির রেখা মিলাবে না। যখনই সংবর্ধিত বা অতিথি মহিলাদের থেকে অসংগতিপূর্ণ কোনো কিছু দেখতে পাবে, তা দেখেও না দেখার ভান করবে বা নীরবে সয়ে যাব। এমনকি বলবে, 'মাশাআল্লাহ! এই মহিলার আচার-ব্যবহার কতই-না মার্জিত! তার চরিত্র কতই-না সুন্দর! তার কথা-বার্তা কতই-না মিষ্ট!' কিন্তু এই মহিলার নিজ স্বামীর সাথে আচরণ সম্পূর্ণ উল্টো। স্বামীর সামনে যায় মুখ বাঁকিয়ে! চেহারা কুঁচকিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থিত হয়। যেমন নাকি এটা এমন কোনো বুড়ির চেহারা, যে ইংরেজদের লবণাক্ত পানীয় পান করে এসেছে মাত্র!

তা ছাড়া অধিকাংশ নারী যখন কারও সাথে সাক্ষাৎ বা ভ্রমণ, অথবা তার কোনো আপনজন বা বান্ধবীর সাথে দেখা করতে বের হয়, তখন তাদের একেক জন এমনভাবে নিজেকে প্রসাধনীর আস্তরণে সজ্জিত করে, যেমনভাবে একজন নববধূ তার স্বামীর জন্য সাজগোজ করে! নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাজায়। পরিচ্ছন্ন করে। নিজের সবচেয়ে সুন্দর জামা পরে।

মোহাচ্ছন্নকারী সুগন্ধি ব্যবহার করে। কিন্তু যখন স্বামীর সামনে আসতে হয়, তখন রান্নাঘর থেকে এলোমেলো কেশে এমন তৈলাক্ত চেহারা নিয়ে বের হয় যে শরীর থেকে রসুন-পেয়াজের উৎকট গন্ধ আসতে থাকে। অথচ স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বেশি। জ্ঞান-বুদ্ধি, দ্বীন-ধর্ম সবই বলে যে নিজ স্বামীর জন্য সাজগোজ করবে; অন্য মানুষের জন্য নয়। তার পাশে উত্তম কাপড়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে, সুন্দর সুন্দর বাক্যবিনিময়ে অবস্থান করবে। মৃদু-মুচকি হাসি, ভালো লাগার কোমল আচরণ, সবকিছুই স্বামীর জন্য বরাদ্দ রাখবে। ঠিক তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবি হলো, স্বামীর কাছে নিজ পরিবারই সবচেয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। নিজ পরিবারেরই সেবা করতে হবে, বাইরের লোকের নয়। সে যদি উদারমনা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও দ্রুত কল্যাণী হয়ে থাকে, তা হলে তার এসব কিছু নিজ পরিবারের জন্যই হবে, শুধু বাইরের মানুষের জন্য নয়। আশ্চর্যের বিষয়, কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন হলো?! আপনজন অশ্রদ্ধার পাত্র বনে গেল আর দূরের জন শ্রদ্ধার যোগ্য!

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, আমি এর কারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

কারণ হলো, কৃত্রিমতা-লৌকিকতায় আমাদের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি। আমি জানি যে, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কৃত্রিমতাকে দূর করে দেয়। অথচ কোনোপ্রকার সন্দেহ ব্যতিরেকে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের পারস্পরিক আচার-আচরণে প্রটোকলের আশ্রয় নেয়, যে প্রটোকল প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়ে হয়ে থাকে। তাদের দুজনের পুরো জীবনটাই হয় ওয়াকিটকির ওপর। এসব আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য যে, যদি স্বামী-স্ত্রী একবার হলেও নিজেদের মধ্যকার কৃত্রিমতাকে পরিহার করতে পারে, তা হলে খুব অনায়াসেই একে অপরের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে পারবে। এতে কোনো দ্বিধা করবে না। কোনো কিছু লুকাতে পারবে না। অথচ প্রতিটি মানুষের একান্ত কিছু বিষয়

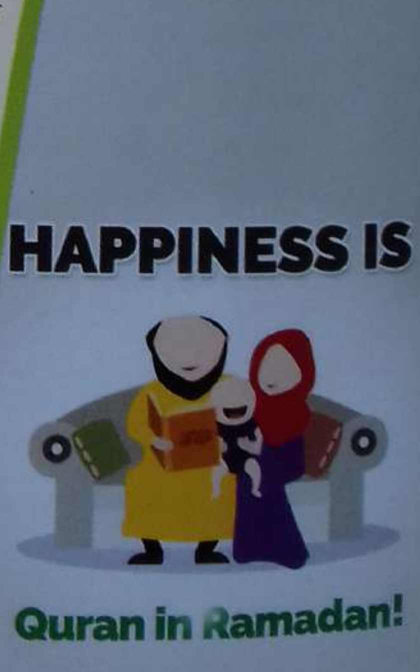

থাকে, যা সে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। এমনকি অতি নিকটজনের কাছেও না। আরবদের প্রবাদ হলো 'অতি নৈকট্যতাই হলো আড়াল।' তোমার চেহারাটা এমনভাবে তোমার প্রিয়জনের কাছাকাছি নিয়ে আসো, যেন তার ও তোমার মাঝে মাত্র এক আঙুলের ব্যবধান থাকে। তখন কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাবে না। বরং নাকের কাছে দেখবে পাহাড়ের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। অথবা সোজা করে তুমি পরস্পর দুটি রেখা টানো। এরপর সামান্য দূরে থেকে রেখা দুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, দেখবে খুবই সোজা; কোনো বক্রতা নেই। কিন্তু যত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে, দেখতে পাবে প্রতিবিন্দু পর পর সরলরেখা দুটো এদিক-সেদিক বেঁকে আছে। একই অবস্থা মানুষেরও।

আমার খুবই ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু ছিল। ত্রিশ বছর যাবত তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কোনোদিন আমি তার থেকে মন্দ কিছু দেখতে পাইনি। সব সময় আমার মতের অনুকূলে তাকে পেয়েছি। একবার তার সাথে দূরে কোথাও সফরে বের হলাম। জায়গা সীমিত থাকায় দুজনের একসাথে একই কামরায় থাকতে হলো। সেখানে তার পানাহার, ওযু ও নিদ্রা দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তার সাথে আমার রাত ও দিনের মতো বৈপরীত্য রয়েছে।

আশা করি, এ আলোচনা থেকে স্বামী-স্ত্রী সুখী-সমৃদ্ধ হবেন। এবং যে সমস্ত যুবক-যুবতী এখনো বিয়ে করেনি, তারা বিয়েতে আগ্রহী হবে।

[সূত্র : মা'আন নাস, পৃষ্ঠা : ১৮৫]

"WHOEVER LOVES THE QUR'AN, LOVES ALLAH."

Sufyan ibn 'Unayah | al-Hilyah (v. 7, p. 278)

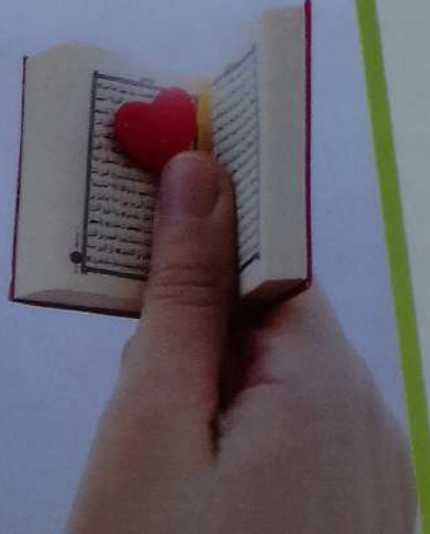

বিয়েকে সহজকরণ

(১৯৬০ সালে প্রকাশিত)

আমি রিয়াদে বিয়ের ব্যাপারে দুটি বিষয় লক্ষ করেছি। এই দুটি বিষয়ের একটি ভালো, অপরটি খারাপ। ভালোটি হলো যুবকদের তাড়াতাড়ি বিয়ে করিয়ে দেওয়া। আর খারাপটি হলো বিয়েতে অতিরিক্ত আড়ম্বরতা, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা।

আমি অনেক আগে থেকেই পশ্চিমা সভ্যতা নিয়ে আমার কথায় বলে এসেছি, পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের মুসলিম সভ্যতায় ঢুকে পড়েছে। এই সভ্যতা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাবার পর এটা থেকে আমাদের জীবনকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন থাকা, বিবেককে প্রয়োগ করা, এই সভ্যতাকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমাদের রবের শরী'য়তকে প্রযোজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর কোনো কর্তব্য বাকি থাকেনি।

এই পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের মুসলিম সভ্যতায় সবচেয়ে জঘন্যতম যে রীতিকে নিয়ে এসেছে, তা হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে তার বন্ধন থেকে খুলে দেওয়া। জৈবিক তাড়নাকে তার গোপন কুঠুরি থেকে উসকে দেওয়া। সুতরাং আমি আজকে এ কথা বলছি, বিয়ে ব্যতীত এই রোগের আর কোনো ওষুধ নেই। আমরা যদি যুবকদের জন্য বিয়েকে সহজ, অনাড়ম্বর ও লৌকিকতামুক্ত না করি, তা হলে আমাদের এসব কথা ও উপদেশ কোনো কাজে আসবে না। [*শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, 'সুতরাং বিয়েকে সহজকরণই হলো প্রথম বাঁধ, যে বাঁধকে শরী'য়ত হারামের পথে নির্মাণ করেছে। কিন্তু আমরা সেই বাঁধকে ভেঙে ফেললাম, যখন বিয়েকে কঠিন করে নিলাম ও ব্যভিচারকে একেবারে সস্তা করে দিলাম।'*

(ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৮)-অনুবাদক]

এই জৈবিক ক্ষুধা মানবিক ক্ষুধার মতো। জৈবিক ক্ষুধা তো একটি শ্রেণিকে বাঁচাতে হয়ে থাকে আর মানবিক ক্ষুধা তো একজন মানুষকে বাঁচাতে হয়ে থাকে। তুমি যদি দু-দিনের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর একজন বুভুক্ষু ব্যক্তিকে নিয়ে এসে কোনো শাহী দস্তরখানের সামনে উপস্থিত করে দস্তরখান থেকে কিছু

খাওয়া থেকে তাকে বাধাপ্রদান করো এবং তাকে খুবই প্রভাব সৃষ্টিকারী উপদেশ দাও, তাতে কি তার পেট ভরবে? বরং এ রকম বুভুক্ষু ব্যক্তির ক্ষুধা যখন প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠবে এবং খাবার তার সামনেই বিদ্যমান থাকবে, সে খেয়ে নেবে এবং তোমার বাধার কোনো পরোয়া করবে না। পক্ষান্তরে তুমি যদি দস্তরখান নিয়ে আসো এবং তাকে বলো যে, ওই দস্তরখান থেকে তোমাকে বাধা দিচ্ছি এবং এই দস্তরখানে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তুমি এটা থেকে খাবে, তা হলে সে তোমার কথা শুনবে ও তোমার আনুগত্য করবে।

শ্রদ্ধাভাজন পাঠকমণ্ডলী, নিশ্চয় ইসলামধর্ম মানুষের একটি মজ্জাগত স্বাভাবিক ধর্ম। বাস্তবতার অনুকূল একটি ধর্ম। ইসলামে বৈরাগ্য ও বঞ্চনার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম যে জিনিসকেই হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার স্থলাভিষিক্ত কোনো জিনিসকে হালাল করে দিয়েছে। সুদকে হারাম করেছে, তো ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছে। ব্যভিচারকে হারাম করেছে, তো বিয়েকে হালাল করে দিয়েছে। ইসলাম তোমাকে হারাম পন্থায় নারী উপভোগ করতে বাঁধা দেয়, কিন্তু হালাল পন্থায় সম্পূর্ণ উপভোগ করতে তোমায় অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু কথা হলো, আমরা কি যুবকদের জন্য বিয়ের রাস্তাকে সহজ করে দিয়েছি? এদিকে আসো তো, একটু দৃষ্টিপাত করি সমাজের দিকে। এই দৃষ্টিপাত থেকেই জবাব মিলবে আমাদের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন যুবকের সত্তার মাঝে এই জৈবিক তাড়নাকে গেঁথে দিয়েছেন এবং তার জন্য দুটি রাস্তা উন্মোচন করে রেখেছেন। একটি হলো সহজ, ইবাদতময় রাস্তা। আর তা হলো বিয়ের রাস্তা। অপরটি হলো ঢালুময়, বিপৎসংকুল, পিচ্ছিল রাস্তা; যা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর তা হলো ব্যভিচারের রাস্তা। আবার ব্যভিচারের রাস্তার সামনে অনেক বাধা-বিপত্তি রেখে দিয়েছেন, যা তাকে এ ঢালুময় পথে গড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমরা এসে এই বিয়ের পথকে বন্ধ করে দিলাম! আমাদের মধ্য থেকে কেউ বন্ধ না করলেও কমছে কম এই পথে কাঁটা, পাথর ও অন্যান্য ভারী বস্তু ফেলে রাখল! উল্টো দিকে আমরা ব্যভিচার এর রাস্তার সম্মুখস্থ সব বাধা-বিপত্তি সরিয়ে নিলাম! এই রাস্তার আশেপাশে গোলাপ ফুল লাগিয়ে আরও সজ্জিত করলাম! আমরা এই রাস্তাকে আরও সুগম করলাম! এটাকেই ইবাদতময় করে তুললাম! [*শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন,*

'আমাদের মহান প্রভু আমাদের ওপর এমন কোনো বস্তু হারাম করেননি, যার পরিবর্তে স্থলাভিষিক্ত ও অভাব পূরণকারী হিসাবে অন্য কোনো বস্তু হালাল করে দেননি। আমাদের প্রভু ব্যভিচারকে হারাম করেছেন, কিন্তু বিয়েকে হালাল করে দিয়েছেন। যে কাজটা বিবাহিত ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সাথে করে, সেই কাজটাই ব্যভিচারী ব্যক্তি কোনো নষ্টা নারীর সাথে করে। তা হলে আমরা কেন বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় বাড়ির সামনে রং-বেরঙের বাতি জ্বালাই, বিয়ের কার্ড ছাপাই ও লোকজনদের দাওয়াত করি? অথচ যে কুকর্ম করতে চায়, সে রাতের অন্ধকারে কুকর্মের দিকে পা বাড়ায় এবং এর জন্য নিষিদ্ধ পল্লি/গলির কোনা খুঁজে ফেরে, যাতে করে তাকে কোনো মানুষ দেখতে না পায়!' শাইখ তানতাবী আরও বলেন–

'বিবাহিত ব্যক্তি ও ব্যভিচারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে পয়সা পকেটে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে, প্রশান্তির সাথে খাওয়ার চেয়ারে বসে ধীরস্থিরভাবে খাবারের মেন্যু তালাশ করে তার ইচ্ছামতো খাবারকে পছন্দ করে। অতঃপর বেয়ারা ওই খাবার নিয়ে আসলে আস্তেআস্তে তা খেতে আরম্ভ করে। এবং ওই চোরের মতো, যে সবার অগোচরে হোটেল থেকে যৎসামান্য খাবার ছিনিয়ে নিয়ে দেয় ভোঁ-দৌড়! আর লোকজনও তার পিছু নিয়ে চিৎকার করতে থাকেড়চোর! চোর! সে দৌড়ের ওপরই কোনো রকম খাবারটা মুখে পুরে নেয়! অতঃপর গরম অবস্থায়ই গলাধঃকরণ করে! অনেক সময় খাবার খাদ্যনালিতে আটকে যায়, একসময় সে তার বুকের মধ্যে সেই আটকা ভাব অনুভব করে। এভাবে সে খাবারটাকে মোটেও তৃপ্তিভরে খেতে পারে না এবং তা গিলতেও পারে না!' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৭)-অনুবাদক]

আপনারা এই কথা থেকে আশ্চর্য হবেন না; বরং কথা শুনতে থাকুনড়আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করলাম। অথচ আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করা যায় না! একজন যুবক ষোলো

বছর বয়সে জৈবিক তাড়নাকে উপলব্ধি করতে শুরু করে। সে এই তাড়নাকে সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে এই দশ বা পনেরো বছরে। ষোলো থেকে নিয়ে ছাব্বিশ বা ত্রিশ বছর পর্যন্ত। আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি এটাই চায়, একজন যুবক এমন বয়সে বিয়ে করে নেবে। এবং যত তাড়াতাড়ি করবে, তত ভালো। আমরা এসে এই বয়সী যুবকদের বিয়েমুক্ত থাকার নিয়ম সাব্যস্ত করলাম! *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, 'জৈবিক চাহিদা পনেরো বছর থেকে শুরু হয় আর পরবর্তী দশক পর্যন্ত দিন দিন শুধু বাড়তে থাকে। অতঃপর পঁচিশ পর্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে! একজন যুবক কি এই বয়সে বিয়ে করতে পারে? আর তা কীভাবে? শিক্ষার নিয়ম-নীতি তো তাকে পঁচিশ বছরের পর পর্যন্তও ক্লাসের বেঞ্চে বসিয়ে রাখে! আর যদি সে উচ্চতর গবেষণার জন্য ইউরোপ বা আমেরিকায় চলে যায়, তা হলে তো তার পড়া-শোনার মেয়াদ আরও প্রলম্বিত হয়ে প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি চলে যায়! তো এই বয়সে সে কী করবে?' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৪)-অনুবাদক]*

আর তা বেশির ভাগ মুসলিম দেশেই। আমরা যুবককে বললাম, একজন ছাত্রের জন্য ছাত্র অবস্থায় বিয়ে করা অসমীচীন। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমার লেখাপড়া শেষ হয়। অথচ আমি অনেক আগে দামেশকের বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করেছিলাম যে, উত্তম হলো ছাত্র অবস্থায় বিয়ে করা। *[শাইখ মুস্তফা আস-সিবায়ী রহ. বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে তাড়াতাড়ি বিয়ে করার পক্ষে। কেননা, তাড়াতাড়ি বিয়ে যুবকদের চরিত্রকে অধিক হেফাজত করে, তাদের দায়িত্ববোধকে বেশি করে অনুভব করিয়ে দেয়। এটা স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপযোগী। বিশেষ করে স্ত্রীর। এখানে আমি যুবক-যুবতীদের এমন সময় পর্যন্ত বিয়েকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই, যে সময়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করার দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা মারাত্মক সমস্যা,*

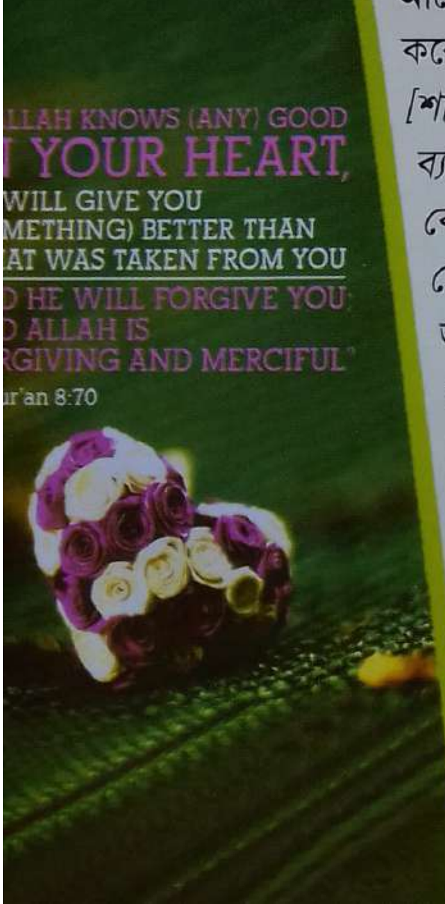

যা আমাদের সমাজকে এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছে, যার কোনো মাশুল নাই। যখন বিয়ের সামগ্রী সহজ হয়ে যাবে ও সামাজিক কুসংস্কারগুলো মিটিয়ে ফেলা হবে, তখন বিয়ে খুব সহজ একটি বিষয়ে রূপান্তরিত হবে। সে হিসাবে যে ছাত্র এখনো তার বাপের পয়সায় লেখাপড়া করে, সে তার বাপের জন্য বোঝা না হয়েও তার কামরাতেই বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে অনায়াসে থাকতে পারবে। আলাদা ঘর বানানোর প্রয়োজন নেই আপাতত। আর আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো, আমরা বিয়ে ও সন্তান উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করব। কেননা, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনের ফলে এটা সম্ভব যে, পড়ুয়া স্বামী-স্ত্রী সন্তানের ওপর খরচ করার সামর্থ্য রাখার আগ পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সারকথা, আমাদের যুবক-যুবতীদের তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলা তাদের চারিত্রিক স্খলন ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাবে, তাদের জৈবিক উন্মত্ততাকে নির্বাপিত করবে, তাদের জীবনপ্রবাহ ও শিক্ষাজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী, ক্ষতিকর ও ভয়াবহ গোপন কুঅভ্যাস থেকে বিরত রাখবে।'

(আল-মারআতু বাইনাল ফিক্বহ ওয়াল ক্বানূন, পৃষ্ঠা : ৫১)-অনুবাদক]

এবং ক্রমান্বয়ে আমেরিকার কতগুলো অনুসন্ধান রিপোর্ট বর্ণনা করেছিলাম, যেগুলোতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে একজন বিবাহিত ছাত্রই অবিবাহিত ছাত্রের চেয়ে ক্লাসের উপস্থিতি ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অধিক মনযোগী। [দামেশকের আল-ওয়াহদাহ পত্রিকার রিপোর্ট : আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিয়ের ব্যাপারটা মহামারি আকার ধারণ করেছে। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের পারসেন্টিস হলো ৪০%। ইংল্যান্ডের সংবাদ হলো : এই মহামারি সেখানেও তদ্রূপ আকার ধারণ করছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন প্রফেসর বলেছেন, ছাত্রাবস্থায়ই বিয়ে করা বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মনোভাব। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হার্ডন বলেছেন, তাড়াতাড়ি বিয়ে করা কোনো ক্ষতি পৌঁছাতে পারে না, যেমনটি মানুষ ধারণা করে থাকে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। বর্তমানে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিয়ের ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছে, তা একটি স্বাভাবিক মজ্জাগত বিষয় ও খুবই উপকারী। একজন বিবাহিত ছাত্র তার ভবিষ্যতের মূল্য অনুধাবন করতে পারে।

(আল-ওয়াহদাহ, ৫/১১/১৯৬১)-অনুবাদক]

তো একজন ছাত্রের লেখাপড়া কবে শেষ হবে? সে তো ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং বারো বছর পর্যন্ত সেখানেই লেখাপড়া করে। অতঃপর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে দেয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরও চার থেকে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে। অনেক সময় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য পশ্চিমা দেশে পাড়ি জমায়। এভাবে তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি চলে যায় অবিবাহিত অবস্থায়ই! এমতাবস্থায় একজন ছাত্র এই পর্যায়ে কী করবে, যে পর্যায়টাই হলো তার জীবনে দেহের শিরা-উপশিরায় জৈবিক তাড়নাকে আস্ফালিত ও যৌন লালসাকে প্রজ্বলিত করার ক্ষেত্রে মারাত্মক পর্যায়? *[শাইখ মুস্তফা আস-সিবায়ী আরও বলেন, 'আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিবাহিত ব্যক্তি হিসাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করব যে, তারা যেন একে অপরকে বিয়ে করে ফেলে। আমি তাদের সৌভাগ্যময়, সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের দায়িত্ব নিলাম। আর এটা আমাদের যুবক-যুবতীদের কাছে চায় যে, তারা সমাজে প্রচলিত ওইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করবে, যে কুসংস্কারগুলো বিয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিয়েকে একটি ব্যয়বহুল বোঝা বানিয়ে রেখেছে। একজন যুবতীর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পিতা-মাতাকে অকপটে বলে নেবে যে, আমি সম্পূর্ণ রাজি যে, আমি বিয়ে করে যুবকের সাথে তার শয়নকক্ষে থাকব যতক্ষণ না যুবক আলাদা ঘর তৈরি করতে সামর্থ্যবান হয়। তদ্রূপ যুবকের জন্যও এমনটি বলাই যথেষ্ট। যখনই এ বিষয়ে কিছু যুবক-যুবতী হিম্মত করে এগিয়ে আসবে, তখন ব্যাপারটা একেবারে সহজ হয়ে যাবে। অন্যান্য যুবক-যুবতীও এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে।'*

(আলমারআতু বাইনাল ফিক্বহ ওয়াল ক্বানূন, পৃষ্ঠা : ৫৩)-অনুবাদক]

হায় আফসোস! (যখন আমরা তাকে হালাল বিয়ে থেকে বাধাগ্রস্ত করলাম) যদি আমরা তাকে তার স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদার ওপর ছেড়ে দিতাম এবং তাতে ইন্ধন যুগিয়ে আরও প্রজ্বলিত না করতাম! যখনই একজন যুবক এই জৈবিক চাহিদাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে রোজা রেখে বা অল্প আহার করে, অথবা সাধনা করে নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে, তখনই আমরা তাকে এটা স্মরণ করিয়ে দিই! সে যখনই হাঁটতে বের হয়, সিনেমা-হলের ফটকে ফটকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির পোস্টার দেখতে পায়, যে পোস্টারগুলোতে

একজন নায়কের বাহুলগ্না নগ্ন নায়িকার নির্লজ্জ ছবি থাকে; যা তার অন্তরে ঘুমন্ত যৌনলালসা জাগিয়ে তোলে! তদ্রূপ সে লাইব্রেরিতে, ম্যাগাজিনের কভারপৃষ্ঠায়, প্রতিটি ফিল্মে, বেশির ভাগ কাহিনিগ্রন্থ বা উপন্যাসগুলোতে যৌনতার সূক্ষ্ম সম্পর্কের স্পষ্ট বর্ণনা পায়; যেগুলো প্রকাশ্যে দেদারসে বিক্রি করা হয়। এমনকি রেডিও সম্প্রচারে, টেলিভিশনে ও তার প্রত্যেক দর্শন ও শ্রবণের জায়গায় এটাই তার স্মরণ হয়, যা সে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো প্রতিটি স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। একজন ছাত্রীর নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত সাজগোজ আর দেহপ্রদর্শনের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেমন নাকি সে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে গমনকারিণী; বিদ্যালয়ে নয়। আর যদি তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ পাঠিয়ে দিই, তা হলে সব বিপদ তো এখানেই। সব সমস্যা তো এখানেই! একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে হরেক রকমের খাবার উপস্থিত। আবার সে খাবারের সুস্বাদু ঘ্রাণ ক্ষুধাবোধকে আরও জাগিয়ে দিচ্ছে, আর আমরা তাকে বলছি, খবরদার! এই খাবার থেকে তুমি খেতে পারবে না! ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তি একটি কূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। ঠান্ডা, মিষ্ট আর সুপেয় পানির জন্য তার বুকের ছাতি ফেঁটে যাচ্ছে। কূপের পানিতে সূর্যের কিরণ পড়ে হীরের মতো ঝকমক করছে। আর আমরা তাকে বলছি, খবরদার! এই পানি থেকে তুমি পান করতে পারবে না! এখন বলুন, এই ব্যক্তি কি খাবার থেকে বা কূপের পানি থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারবে? এসব সত্ত্বেও যদি কোনো যুবক বিয়ে করতে চায়, সে বেশ কতগুলো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা হলো মহর। আমি শুনেছি, আরব দেশগুলোর বেশির ভাগ অঞ্চলে মহরের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। বিবাহ করতে ইচ্ছুক এমন কোনো যুবক, যার পয়সা-ওয়ালা কোনো অভিভাবক নেই; সে বিবাহ করতে অপারগ হচ্ছে।

তারপরের প্রতিবন্ধকতা হলো আল্লাহর বিধানবহির্ভূত অতি আড়ম্বরপূর্ণ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান। সামাজিক এই আচার-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে ছোট আচার হলো এই যে, বিবাহেচ্ছু যুবক দুটি ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করবে। অনেক সময় এই দুই ওয়ালীমায় আগত অতিথির সংখ্যা পাঁচ শয় গিয়ে দাঁড়ায়! দুটি ওয়ালীমা! প্রত্যেক ওয়ালীমার খরচই যুবকের সংসার ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক দেশেই এসব আচার-অনুষ্ঠানের কিছু না-কিছু রং-ঢং বিদ্যমান। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধরনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও ফলাফলের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। আর ফলাফল হলো, বিয়েকে হ্রাস করে ফেলা। একজন যুবককে বিয়ে থেকে বিমুখ করে নেওয়া। মেয়েদের বিয়ের বাজার মন্দা করা। মেয়েদের তাদের পিতার ঘরে আইবুড়ো বানিয়ে রাখা। আর এসব কিছুর কুফল হলো, সমাজে ব্যভিচারকে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেওয়া। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু আপনি তাকে সেই ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে বাধা দিয়ে বসলেন; সে জানালা দিয়েই ঢুকবে। আমি অনেক আগে *আর-রিসালাহ* নামক গ্রন্থে 'ক্ষুধার্ত পেট আর নষ্ট সম্পদ' নামে একটি রচনা লিখেছিলাম। সেখানে আমি আমি আমার নিজ চোখে দেখা কতগুলো বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো, আমার এক মধ্যবিত্ত বন্ধু বিয়ে করেছে। বিয়ের দিন তাকে তার বন্ধুরা বিভিন্ন ধরনের ফুলের তোড়া উপহার দিল। একেকটির মূল্য হবে সিরিয়ান দশ থেকে পঁচিশ লিরা।

সব মিলিয়ে একত্রে মূল্য হবে এক হাজার সিরিয়ান লিরা। তারা ফুলের তোড়াগুলোকে দুলহা-দুলহিনের চারপাশে সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখল। যখন বিয়ের দিনগুলো শেষ হয়ে গেল, আস্তে আস্তে ফুলের তোড়াগুলো পচে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল। অতঃপর তারা এই তোড়াগুলোকে বহন করার জন্য কিছু লোককে ডেকে এনে পারিশ্রমিক দান করল, যাতে তারা এগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে।

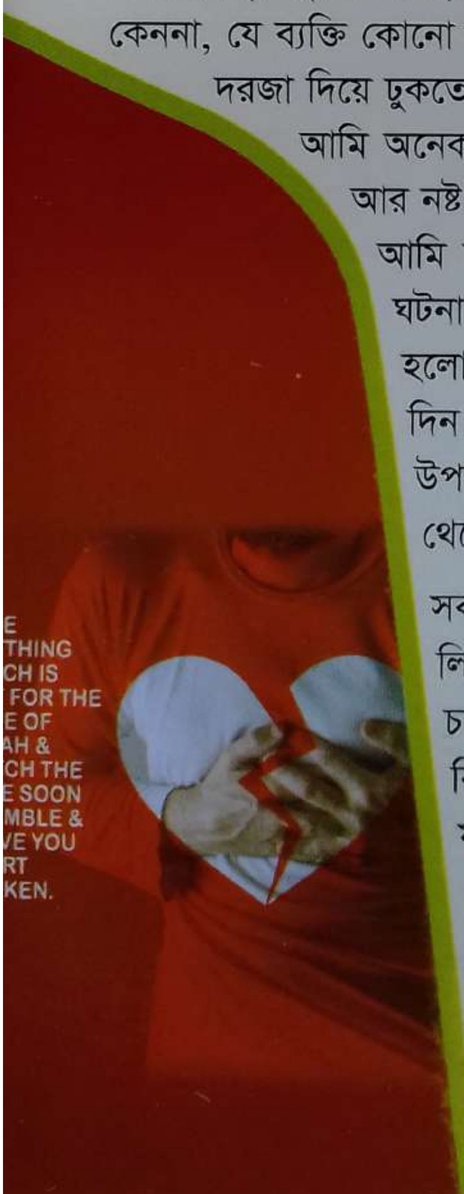

['ক্ষুধার্ত পেট ও নষ্ট সম্পদ' রচনাটি ফী সাবিলিল ইসলাহ নামক গ্রন্থে বিদ্যমান। সেখানে তানতাবী রহ. উক্ত ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমি এক ব্যক্তিকে চিনি। সে বিয়ে করল। বিয়ের দিন তার গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতিজনরা তার বিয়েতে এক শ ষোলোটা ফুলের তোড়া উপহার হিসাবে প্রদান করল। সবচেয়ে নিম্নমানেরটা ছিল পাঁচ লিরা মূল্যের। সবচেয়ে উচুঁমানেরটার মূল্য ছিল বিশ লিরা। প্রথম সমস্যা দেখা দিল এগুলো কোথায় রাখা যাবে তা নিয়ে। এগুলো রাখার জন্য পাত্রই-বা কোথায় মিলবে! অতঃপর এগুলো দুলহা-দুলহিনের চারপাশে সারিবদ্ধ করে রাখা হলো। উপস্থিত এগুলোকে খুবই দৃষ্টিনন্দন লাগছিল। কিন্তু কয়েক দিন যেতে না-যেতেই এগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়াল। অতঃপর লোক ভাড়া করে এনে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হলো!

অন্যান্য ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ঘটনা শাইখ তানতাবী এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'আমি একজন ব্যবসায়ীকে চিনি। যার নির্বুদ্ধিতা, অপচয় ও আল্লাহর নি'আমতের না-শোকরী এটাই চাইল যে, সে তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঁচ শ অতিথিকে রুপার বড় থালায় স্ফটিকের পাত্রে মিষ্টি খাওয়াবে। প্রত্যেকটির দাম পনেরো লিরা। একত্রে সবগুলোর মূল্য সাত হাজার পনেরো শ লিরা! জানি না এসব আমাদের দেশে কবে আমদানি হলো!' (ফী সাবীলিল ইসলাহ, পৃষ্ঠা : ২৯)-অনুবাদক]

আমি বলি, হে লোকসকল, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? এক হাজার সিরিয়ান লিরা, মানে এগারো শ সৌদি রিয়াল, ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অথচ শহরে ফকীর-মিসকিনেরা রয়েছে! আপনারা কি নিজেদের বিপদমুক্ত মনে করেন যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করবেন না বা আসমান থেকে উল্কা নিক্ষেপ করবেন না? প্রতিটি আক্বদ বা বিয়ের অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ সম্পদ নষ্ট করা হয়, তা দিয়ে বিশটি পরিবার অনায়াসে এক সপ্তাহ পর্যন্ত পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে পারবে। আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের বিবেক কি এটা সমর্থন করে যে আমরা এমন খাতে সম্পদ ব্যয় করি, যা মানুষের কোনো উপকার পৌঁছায় না, আবার তা আল্লাহর শাস্তি ডেকে আনে?

হল্যান্ডে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। সংস্থাটির কাজ ছিল এসব আচার-অনুষ্ঠানে মানুষ যেসব ফুলের তোড়া উপহারস্বরূপ দিয়ে থাকে, তার মূল্য একত্র করা। এভাবে দশ বছরে সংস্থাটি এগুলোর মূল্য দিয়ে ছয়টি

হাসপাতাল নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল!

এ রকম জনহিতকর কাজে তো আমরা মুসলমানেরা তাদের চেয়ে বেশি উপযোগী। কেননা, আমাদের দ্বীন অতিরিক্ত খরচকে হারাম সাব্যস্ত করে এবং অতিরিক্ত খরচকারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যা দেয়।

ব্যভিচারের মোকাবিলা করতে যা-ই বলা হোক না কেন, নীতি-নৈতিকতা আর মান-মর্যাদার সাহায্যের জন্য যা কিছুই করা হোক না কেন, তা কোনো উপকারে আসবে না; যদি না তার সাথে বিয়েটা থাকে। আমি বিয়ের ব্যাপারে অনেক অনেক বলেছি। ঢের লেখালেখি করেছি। মহরের ব্যাপারে, যৌতুকের ব্যাপারে, ভালোবাসার ওপর বিয়ের ভিত্তির ব্যাপারে ও বিয়ের জটিলতার ব্যাপারে। এখানে আমি সেসব কথাকে পাঠকের সামনে পুনরায় লিখতে চাই না, তবে সামান্য একটু ইঙ্গিত করতে পারি। কারণ, অনেক কথাই আছে যেগুলো বার বার আলোচনা করলে পুরোনো হয় না। অচিরেই আমি আগত কথাসমূহে বিয়ে সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি এই কথাগুলোকে ফলদায়ক বানাবেন। আর যদি কোনো পাঠকের কাছে ওই কথাগুলোর কোনো একটি ভালো লেগে যায় এবং সে আমার বদলা দিতে চায়, সে যেন আমার জন্য দূরে থেকে দু'আ করে এবং আমাকে যেন এ ব্যাপারে অবহিত না করে। যাতে এই দু'আটা শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। কেননা, দূরে থেকে একজন মুমিনের দু'আ অপর মুমিনের জন্য কবুল হয়ে থাকে। আমি এমন এক ব্যক্তি, যার নেক আমল নেই বললেই চলে। সুতরাং আমি এসব দু'আর মাধ্যমে আমার জন্য পুণ্যের আশা করি।

হারামের পথে প্রথম বাধা হলো আল্লাহর ভয়। *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, 'আর সবচেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী বাঁধ ছিল আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের ভীতি। কিন্তু আমরা আমাদের থেকে ধর্মীয় দীক্ষার ফলকে ঠেলে দূর করে দিলাম, আমাদের সন্তানদের আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের ভীতিকে ভুলিয়ে নিলাম! এখনকার যুবক তো মসজিদের রাস্তাটাই চেনেনা, যদি-না কোনো দিন তার নামাযী পিতা তার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে হাত ধরে তাকে মসজিদের পানে নিয়ে চলে!' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ২৪)-অনুবাদক]*

যদি কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারের ইচ্ছা পোষণ করে, এবং তার জন্য প্রস্তুতিও

নিয়ে নেয়, অতঃপর তাকিয়ে দেখে, তার পিতা বা উস্তাদ, যাকে সে সম্মান করে, জানালা দিয়ে তার প্রতি তাকিয়ে আছেন -সে কি তখন ব্যভিচার করতে পারবে? তা হলে যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে এবং এটা স্মরণ করে যে, আল্লাহ তার ব্যাপারে অবগত আছেন– সে কীভাবে ব্যভিচার করতে পারে? আর এ কথাটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন, 'ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।' সুতরাং আমরা এই প্রতিবন্ধকতাকে উঠিয়ে নিলাম। আমরা এই বাঁধকে ভেঙে ফেললাম, যখন আমরা আমাদের সন্তানদের আল্লাহর ভয়ের দীক্ষাদান ছেড়ে দিলাম এবং বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্বহীনতার চোখে দেখলাম বা এই শিক্ষাকে আত্মাহীন একটি মরা লাশ বানিয়ে নিলাম, যা কোনো ফল বয়ে আনে না।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো যৌনরোগের ভয়। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকেই কত জন ডাক্তার বের হলো এবং এই বলে ঘোষণা করল যে, তোমরা রোগের ভয় কোরো না, আমাদের কাছে প্রত্যেক রোগের ওষুধ বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা এগোও এবং কিছু পরোয়া কোরো না। *[এ বিষয়টাকে শাইখ তানতাবী রহ. আরও সুন্দর করে এভাবে বুঝিয়েছেন, 'চতুর্থ বাঁধ ছিল অসুস্থতার ভয়। এ ক্ষেত্রে কতিপয় ডাক্তার জোরালো কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলল, হে লম্পটের দল, তোমরা অসুস্থতার ভয় কোরো না। কেননা, আমাদের কাছে পেনিসিলিন (Penicillin), স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin), টেরামাইসিন (Terramycin), ইবলিসিন (ইবলিসের দিকে সম্বন্ধ) ও প্রত্যেক এমন ওষুধ, যার নামে ওই 'সি' অক্ষর আছে, তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যখনই তোমাদের মাঝে কোনো যৌনরোগ দেখা দেবে, আমরা তা দূর করে দেব। সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। সামনে বাড়তে থাকো! সুতরাং লম্পটের দল আগে বাড়তেই থাকল, কোনো ভয়কে পাত্তা দিলো না। এভাবেই চতুর্থ বাঁধটাও*

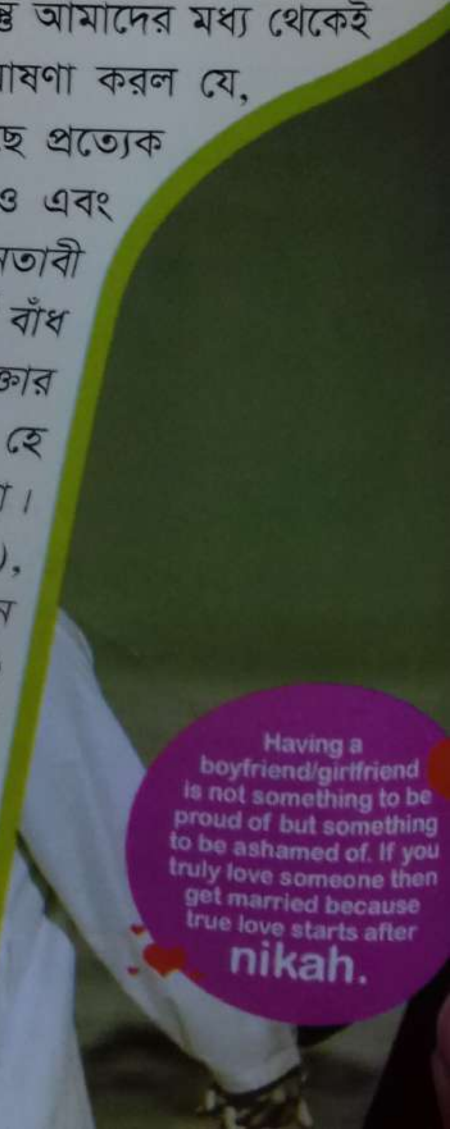

ভেঙে গেল!' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ২৩)-অনুবাদক]

তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো অপমানের ভয়। একসময় ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজেকে লোকচক্ষু হতে লুকিয়ে রাখত। নিজেকে গুটিয়ে রাখত। ব্যভিচার একজন ব্যভিচারীর ললাটে কলঙ্কের তিলক হিসাবে এঁটে থাকত, মৃত্যু অবধি। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। কিছু যুবক তার এ ধরনের কাজ (ব্যভিচার) কে নিয়ে গর্ববোধ করে! প্রকাশ্যে সিরিয়াল ধরে তা বর্ণনা করে! অনেক সময় এ বিষয়ে বই রচনা করে তাতে এসব বিশদভাবে আলোকপাত করে! বরং বিষয়টা তো এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে স্বয়ং আমাদের সিরিয়ার কিছু নারী বই রচনা করে তাতে তার ও তার প্রেমিক পুরুষের মধ্যকার এসব হারাম ফষ্টিনষ্টির কাহিনিগুলো লিখে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে! সুতরাং আমরা তৃতীয় বাঁধকেও ভেঙে দিলাম। *[শাইখ তানতাবী রহ. বলেন, 'তৃতীয় বাঁধ ছিল মানহানির ভয়। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমনকি লম্পট যুবক তার লাম্পট্যকে নিয়ে গর্ববোধ করে! তার পাপাচারের কাহিনিগুলোকে সিরিয়াল করে বর্ণনা করে! অথচ একসময় লম্পট যুবক তার লাম্পট্যকে ঢেকে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত। লুকাত। প্রশ্ন করলে মানত না, অস্বীকার করত। এখন তো অশ্লীল কাহিনিগুলো প্রত্যেক পাঠকের জন্য বৈধ হয়ে গেছে! সবচেয়ে কুরুচিপূর্ণ কাহিনিসমূহ, যেগুলোকে মানুষেরা জৈবিক কাহিনি বলে থাকে; এগুলোকে চিত্রকারের তুলি অথবা লেখকের কলম দিয়ে অঙ্কিত করা হয়, যেগুলোকে যুবক-যুবতী পাঠ করে! আবার আমাদের সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচকদের মুখ দিয়েই এগুলোর লেখকদের প্রশংসা করানো হয়!*

আমি বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও খুবই সম্মানের অধিকারী একজন সাহিত্যিকের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছি, যিনি তার ওই প্রবন্ধে প্রশংসা করছেন লম্পট লেখক আলবার্তো মুরাভিয়া (Alberto Muravia) ও অন্য আরেক লম্পট লেখক অস্কার উইল্ড (Asker Wild)-এর, যে অনেক

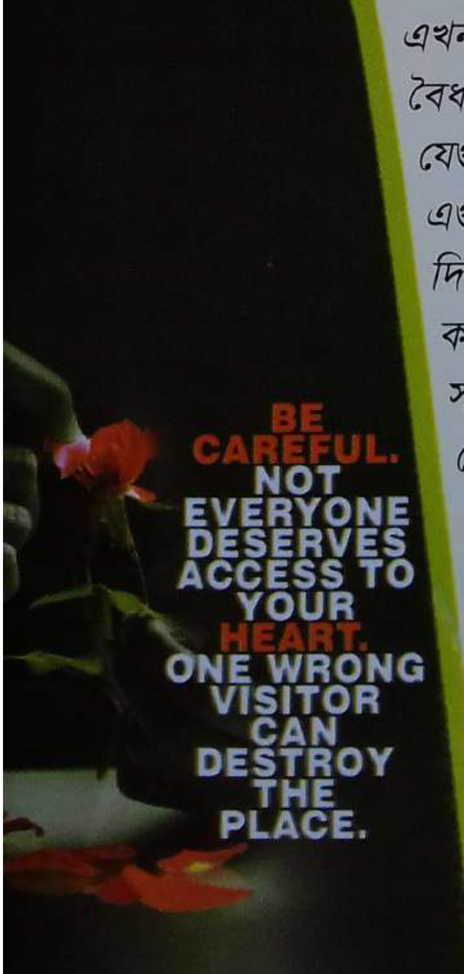

আগেই দুনিয়া ত্যাগ করেছে। যে প্রশংসা যুবকদের তাদের লিখনী পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করবে! আর টিভিতে ফিল্মসমূহ ওইসব যৌনতার কাহিনিগুলোকে সম্প্রচার করে চলেছে তাদের জন্য, যাদের কাছে এখনো ওগুলো পৌঁছেনি অথবা যারা এসব পড়তে ভালোবাসে না। আমরা তো ভুলে গেছি, গুনাহের প্রচার হলো ইসলামের দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র আরেকটি গুনাহ। এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহকারী ব্যক্তিকে তার গুনাহের কথা লুকিয়ে রাখতে ও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে শিক্ষা দিয়েছেন।

বরং আমি সিরিয়ার দুই সাহিত্যিক মেয়ের দুটি কাহিনি পড়েছি, তাদের দুজনের একজন তার প্রেমিকের সাথে ঘটে যাওয়া রসালো কাহিনি বর্ণনা করছে। অথচ তাদের মাঝে কোনো ধরনের শর'য়ী আক্বদ হয়নি! কাহিনিতে মেয়েটি তার অনুসৃত আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করছে পাপিষ্ঠা জর্জ সান্ড *(Georeg Sand)* কে তার প্রেমিক আলফ্রেডো মুসা *(Alfredo Musa)*-এর সাথে, যে কিনা তার চেয়েও আরও বেশি পাপিষ্ঠ ছিল! সুতরাং তৃতীয় বাঁধও ভেঙে পড়ল!' *(ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ২১)-অনুবাদক]* এখন যুবককে আল্লাহর ভয়, রোগের ভয় ও অপমানের ভয় কোনো কিছুই বাধা প্রদান করতে পারে না। *[সূত্র : ফুসূলুন ইজতিমাঈয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ২৩১]*

বিয়ের জটিলতা

(১৯৫৮ সালে প্রকাশিত)

আজ আমাদের দেশে মানুষের সামাজিক জটিলতাসমূহের মধ্য থেকে এমন একটি জটিলতা রয়েছে, যেটা মুসলিম উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী। আর সেটা হলো বিয়ের জটিলতা। বর্তমান এই জটিলতাকে এককথায় এভাবে বলতে হয় যে আমাদের মাঝে বিয়ের উপযুক্ত হাজার হাজার এমন মেয়ে রয়েছে, যারা বিবাহেচ্ছু পাত্র পাচ্ছে না। তদ্রূপ আমাদের মাঝে হাজার হাজার যুবক আছে, যারা উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না অথবা তারা বিয়েই করতে চাচ্ছে না। *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, 'হাজার হাজার অবিবাহিত যুবকে এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটাচ্ছে, তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেসব যুবতীদের, যাদের আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ হাজার হাজার অবিবাহিতা যুবতী বিনীদ্র রজনী যাপন করছে, অধীর আগ্রহে সেসব যুবকদের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনে চলেছে, যাদের আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'*

(ফী সাবীলিল ইসলাহ, পৃষ্ঠা : ১৭২)-অনুবাদক]

আপনারা এই জটিলতার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা কিছুটা অনুভব করার জন্য একটা খাতা ও কলম হাতে নিন। এরপর তাতে ওই সকল ঘরের নাম লিখুন, যে সকল ঘরে অনূঢ়া মেয়েরা রয়েছে এবং সাথে ওই সকল ঘরের নাম লিখুন, যে সকল ঘরে অনূঢ় যুবকরা রয়েছ। হে পাঠকবর্গ, আপনারা দেখতে পাবেন, আপনাদের পরিচিতজনদের মধ্য থেকেই এ ধরনের দশটি মেয়ে ও দশটি যুবক বিদ্যমান রয়েছে। *[লেবাননের প্রখ্যাত লেখিকা ফাতেমা ফাসায়ী তাঁর একটি তাত্ত্বিক লিখনীতে আরববিশ্বের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল : 'আজকের যুবতী চিৎকার করে বলছে, সতীন মেনে নিয়ে হলেও আমি বিয়ে করতে চাই'। ফাতেমা ফাসায়ী তাঁর এ*

লেখায় বলেন, বর্তমান আরববিশ্বে আইবুড়ো সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর তা দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। লেবাননে আইবুড়োত্বের পার্সেন্টিজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি যুবতীদের বিয়ের বয়সের পার্সেন্টিজ আগের চেয়ে আরও বেড়ে চলছে। লেবাননী যুবতীদের বিয়ের বয়সের পার্সেন্টিজ এখন বাইশ থেকে ছাব্বিশ। লেবাননে বিয়ের উপযুক্ত যুবতীদের যুবকদের সাথে তুলনা করার কোনো সূক্ষ্ম সমীক্ষা নেই, তবুও এখানে একজন লেবাননী যুবকের ভাগে কমপক্ষে চার থেকে সাত জন লেবাননী যুবতী পড়ে!

আরবের একটি পর্যবেক্ষক সংস্থার তথ্যমতে আরবের যুবতীদের তিন ভাগের এক ভাগ বর্তমানে আইবুড়ো সমস্যায় ভুগছে। এদের ত্রিশেরও অধিক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি! সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানে আইবুড়োত্বের পার্সেন্টিজ এখন ৫০%! ইরাকে আরও বেশি ৫৮%! আর তা দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে। আলজেরিয়ায় আইবুড়োত্বের পার্সেন্টিজ ৫১%! সেখানে কয়েক মিলিয়ন যুবক-যুবতী পঁয়ত্রিশ বছর পাড়ি দেওয়ার পরও এখনো তাদের বিয়ে হয়নি!

মিসরের আল-মাইদান পত্রিকার সমীক্ষানুযায়ী প্রত্যেক দশ জন মিসরী যুবতীর মধ্য থেকে মাত্র এক জনের বিয়ে হয়! আবার মিসরী যুবতীদের বিয়ের বয়সের পার্সেন্টিজ বাইশ থেকে বত্রিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! অপরদিকে মিসরী যুবকেরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের পর বিয়ে করতে ব্রতী হয়। এর আগে চাকরির বেতন অর্জন করে মহর জোগাড়ের ফিকিরে কাটায়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সেথায় যুবক-যুবতীদের অবৈধ সম্পর্ক মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সেখানে কয়েক মিলিয়ন যুবতী বিয়েমন্দায় ভুগছে! ফাতেমা ফাসায়ী তাঁর লেখায় বলেন, এসবের প্রধান কারণ হলো :

* অর্থনৈতিক সমস্যা। ঘর-দোর নির্মাণের খরচ, মোটা অংকের মহর ও বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যয়বহুল খরচ।

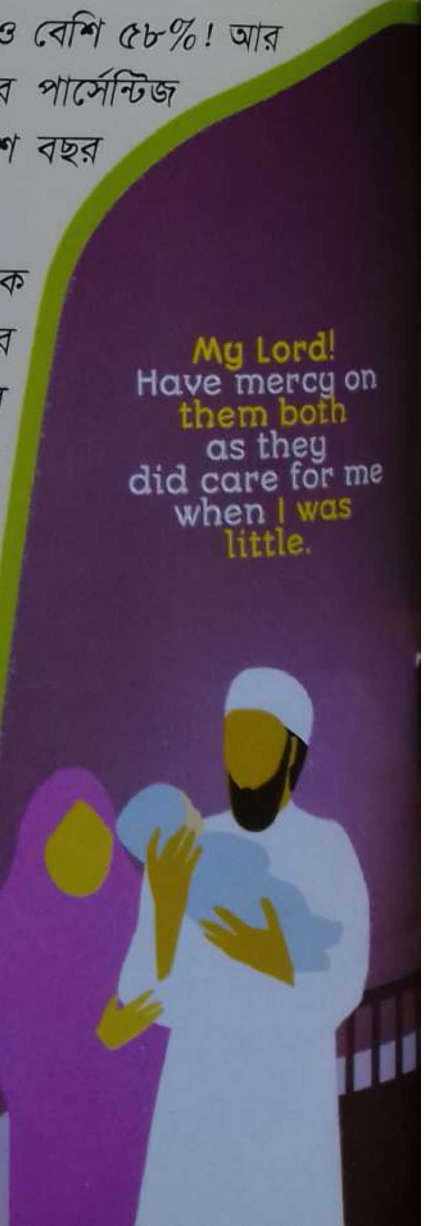

** চাকরি বা পড়াশোনার জন্য যুবকদের অন্যত্র পাড়ি জমানো।*

** সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক অসমন্বয়।*

ফাতেমা ফাসায়ী বলেন, এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কিছু যুবতী একসাথে থেকে সংসার না করে হলেও বিবাহিত পুরুষের সাথে বিয়েকে প্রাধান্য দিচ্ছে! এমনকি কোনো কোনো যুবতী তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হলেও বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে রাজি। তবুও আইবুড়োত্বের জেল থেকে মুক্তি পেতে চায়!'

(লেবানন হতে প্রকাশিত আশ-শুররা পত্রিকা, ৭/৭/২০০৭। পৃষ্ঠা : ৫০-৫৭)-অনুবাদক]

আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো, এই জটিলতার কারণ ও ফল নির্ধারণ করা এবং তা থেকে পরিত্রাণের পন্থা নির্ধারণ করা।

এই জটিলতার ফল হলো নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক স্খলন, যার অভিযোগ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশই করে থাকে। আমি এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। কারণ, এ বিষয় নিয়ে সরাসরি কারও সাথে কথা বলতে পারছি না। আবার আমার সামনে এ ধরনের কোনো লোকও নেই। তাদের রুচি ও চেতনা, মন-মানসিকতা ও মননশীলতা বোঝাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বর্তমানে বেতারকেন্দ্রে বসে কথা বলছি। কথাগুলো এখান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রচারিত হচ্ছে। আমার জানা নেই, কারা আমার কথাগুলো শুনে চলেছেন। শ্রোতাদের মাঝে হয়তো মেয়ে ও যুবকেরা রয়েছে, এবং এমন আরও অনেকেই রয়েছে, যাদের সামনে এ ধরনের আলোচনা করা অসুন্দর।

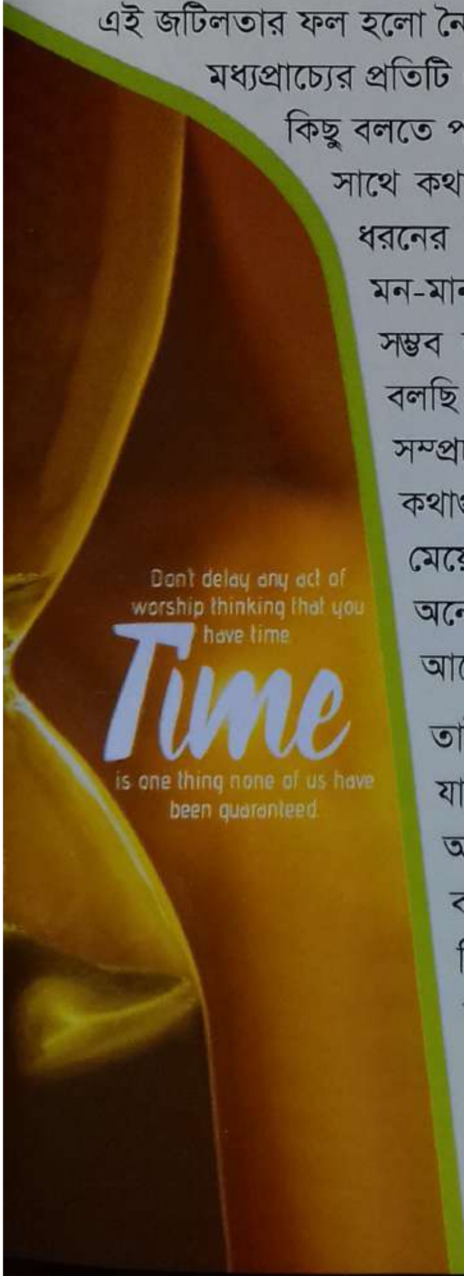

তাই আমি শুধু এটুকুই বলছি যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তার স্থলে আরেকটি বস্তু হালাল করে দিয়েছেন। আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু বিয়েকে হালাল করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য

হালাল পথকে বন্ধ করে দেবে, তার জন্য হারাম ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। *[শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. বলেন, 'প্রকৃতার্থে বিয়ে হলো মানুষের একটি বেসামাল মজ্জাগত চাহিদা। নারী হোক বা পুরুষড়উভয়ের মধ্যেই বেসামাল এই চাহিদাটা বিদ্যমান। সুতরাং মজ্জাগত স্বভাবের চাহিদা পরিপূর্ণ হবে না বিয়ে ব্যতীত। কেননা, মানুষকে নারী ও পুরুষের যৌথ সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের সত্তাগত সৃষ্টি নারী-পুরুষের সমন্বয়ে। এবং নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের প্রকৃতিগত পরিপূর্ণতা একে অপরের মাধ্যমে।' (আল-উলামাউল উযযাব আল্লাযীনা আ-ছারুল ইলমা আ'লায যাওয়াজ, পৃষ্ঠা : ৬)-অনুবাদক]*

বিয়ের স্বল্পতার কারণে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যে ফল দাঁড়ায় তা হলো, ব্যভিচার ও দুরাচার এর আধিক্য। এখানে আমি এই নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও আলাদা কিছুটা আলোচনা করব। এবং এটা সাব্যস্ত করব যে, এই অধঃপতন থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো বিয়েকে সহজ করা। *[অনেক পশ্চিমা গবেষকরাই স্বীকার করেছেন যে যুবকদের জৈবিক সমস্যা সমাধানের জন্য লোকেরা যা কিছুই করুক না কেন, সবকিছুই হলো সাময়িক ও অস্থায়ী কিছু টিপস। জৈবিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপকারী ব্যবস্থাপত্র হলো ত্বরিত বিবাহ। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ চারল বলেন, 'যুবকদের তাদের যৌনতাড়না ও কামলালসা থেকে ফেরানোর জন্য শুধু উপদেশই যথেষ্ট নয়; বরং ব্যাপকভাবে সামাজিক সংশোধনীমূলক উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আর এসব সংশোধনীর প্রথমই হলো ত্বরিত বিয়ের পথে প্রতিবন্ধক বস্তুগুলো সরিয়ে নেওয়া। যেমন : টাকা-পয়সা না থাকা, বাসস্থান সংকট এবং মাতা-পিতা ও কর্ণধারদের পক্ষ থেকে একঘেয়েমি।*

(আত-তারবিয়্যাতুল জিনসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৩৫)-অনুবাদক]

বিয়ের জটিলতা সৃষ্টির কারণগুলো হলো

প্রথম কারণ, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আল্লাহপ্রদত্ত শাশ্বত সত্যের চিরায়ত রীতি, জৈবিক চাহিদা এবং বস্তুজগতের বাস্তবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটার ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা যুবক-যুবতীর মাঝে জৈবিক চাহিদা বা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের উপকরণ গেঁথে রেখেছেন। এবং সে সূক্ষ্ম চাহিদা প্রকাশের জন্য পনেরো বা এর কাছাকাছি বয়সকে নির্ধারণ করেছেন। যখন কোনো ছেলে অথবা মেয়ে এই বয়সে

উপনীত হয়, তখন নিজের ভেতর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তাড়না অনুভব করে। এতদিন যা ঘুমন্ত ও অচেতন ছিল, তা এ বয়সে এসে জাগ্রত ও সচেতন হয়ে পড়ে। অপর দিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুবক-যুবতীদের পঁচিশ বছর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসে থাকাকে বাধ্যতামূলক করে রাখে। একটি শিশু সাত বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। টানা বারো বছর প্রথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। তখন তার বয়স উনিশে পৌঁছে। এরপর ভার্সিটিতে চার থেকে সাত বছর লেখাপড়া করে। এ সময় তার বয়স হয় তেইশ অথবা ছাব্বিশ। এরপর তো অনেকেই ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি জমায়। সেখানে কমপক্ষে আরও তিন বছর লেগে যায়। ফলে দেখা যায়, শিক্ষাজীবন পাড়ি দিতেই ত্রিশ বছর শেষ! *[এখানে সামহোয়ার ইন ব্লগের একটি লেখা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। ব্লগার সেখানে বলছেন :*

"বেশি বয়সে বিয়ে করার আইডিয়া আমাদের সমাজ এত বেশি খেয়েছে যে, ছেলেদের ৩০-এর আগে এবং মেয়েদের ২৩-২৪ এর আগে বিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ গোনার বাইরে রেখেছে। আমাদের আঁতলামি টিভি নাটকগুলোতে ও কিছু কিছু সিনেমাতে ইঁচড়ে পাকা, ত্যাড়া-ঢংগী নায়িকা বা তাদের মা-বাবারা আইবুড়োদের নিয়ে নিয়মিত ঢং করে ডায়লগ দেয়, 'লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে নিয়ে ভাবছি না'। বিয়েতে যত আপত্তি, বিয়েবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্কে ততোটা নয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা দুই প্রজন্ম আগের মত উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করতে পারছে না, আর সামাজিক-ধর্মীয় কারণে পাশ্চাত্য বা আফ্রিকান তরিকায় অবাধে জৈবিক চাহিদাও মেটাতে পারছে না; এতে অনৈতিকতা থেমে থাকছে না, থাকার কথাও না; বাড়ছে লুকোচুরি সম্পর্ক, বাড়ছে পাপাচার এবং ব্যক্তি ও সামাজিক অবক্ষয়। সমাজে ধর্ষণ ও যৌননির্যাতন বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ আমার মতে এই বিলম্ব বিয়ে। যার মাতৃত্বের গড় উপযুক্ত বয়সের শেষ ২৭ বছরে (এটা পশ্চিমা হিসাবে, আমাদের দেশে তা আরও আগে হওয়ার কথা), তাকে লেখাপড়া শেষ (মাস্টার্স) করে ২৫-২৬ বছরে বিয়ে করার নসিহত কী পরিমাণ গর্হিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বাস্তব পরিস্থিতি হলো, পড়ালেখা শেষ করেই সে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসবে, এমনটা খুবই কম ঘটে। ততদিনে আইবুড়ো হয়ে নিজ ও পরিবারের জন্য হতাশা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেলেঙ্কারি নিয়ে আসে।

পশ্চিমা বিশ্ব ও আমাদের দেশে প্রচলিত তাদের শিক্ষাব্যবস্থা পারলে মাতৃত্বের শরীরবৃত্তীয় চক্রকে ১৮-২৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ২৫-৩৫ বছর করে দেয়! পারলে সেটাই হত, কিন্তু স্রষ্টার ইচ্ছাকে কে রদ করবে? আমাদের আধুনিক সমাজব্যবস্থা এই প্রাকৃতিক নিয়মকে তুচ্ছ করতে চাইছে, সেটা হবার নয়। প্রকৃতির নিয়মকে ধারণ করে জীবন সাজানোই সমস্যার সবচে সেরা সমাধান।" ('বাল্যবিয়ে বনাম আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে বিলম্ব বিয়ে'-(সামহোয়ার ইন ব্লগ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪)-অনুবাদক]

তা হলে কীভাবে একজন মানুষ এই দশ অথবা পনেরো বছর সততার সঙ্গে কাটাতে পারে, যখন তার স্নায়ুর কোষে কোষে জৈবিক চাহিদার পূর্ণ জোয়ার, শিরা-উপশিরায় প্রবৃত্তির তাড়না, বিশেষ করে যখন সে এমন পরিবেশে জীবনাতিপাত করছে, যা যৌন প্ররোচক বিষয়াবলি দ্বারা ভরপুর! আর যদি পশ্চিমা দেশে সফর করে থাকে, তা হলে তো আরও বেশি যৌন প্ররোচক বিষয়াবলির সম্মুখীন হয়ে পড়ে!

আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় যৌনতাড়না-সংক্রান্ত নয় যে আমি জানতে চাইব এ সময়ে তারা কী করে? বরং আমার আলোচ্য বিষয় হলো কীভাবে বিয়ে করা সম্ভব, যেখানে যুবক-যুবতী এই ব্যবস্থাপনা মানতে বাধ্য কোনো প্রকার রোজগারি ও আয় ব্যতীত? ত্রিশ বছরের আগ পর্যন্ত তো তারা বাবার খেয়ে লালিত-পালিত থাকে। এরপর তো আরও কয়েক বছর স্বাভাবিকভাবেই অনূঢ় থেকে যায়, শুধু বিয়ের খরচাদি জোগাড় করার চেষ্টায়। ফলে কারও কারও বয়স হয় পঁয়ত্রিশ! অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যারা এই বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে যায়, তারা আর কখনো বিয়ে করে না। কেননা, তখন বিয়ের প্রতি আগ্রহ দুর্বল হয়ে যায়। জৈবিক চাহিদার অঙ্গার নির্বাপিত হতে শুরু করে। যৌবন-জোয়ারেও ভাটা নেমে আসে।

যা-ই হোক, আমার মতে জটিলতার প্রথম কারণ হলো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। অর্ধ-শতাব্দী আগে

যখন দামেশকের স্বাভাবিক রীতি এই ছিল, বেশির ভাগ মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকানির্বাহ করত, তারা এই ভার্সিটিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে চিনতই না, তখন কুড়ি বছরের একজন যুবক একটা দোকানের মালিক বনে যেত। সে আয়ের অধিকারী হতো। একটা ব্যবসার মালিক থাকত। অপর দিকে সে হয়ে যেত একজন স্বামী, বাবা ও পরিবারের হর্তাকর্তা। আর মেয়েদের চৌদ্দ বছর হলে বিয়ে দেওয়া হতো। *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. অন্যত্র বলেন, 'আর যদি সে বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করে, তা হলে সে অর্থ-কড়ি পাবে কোথায়? সে তো সক্ষম পুরুষদের কাতারে থাকা সত্ত্বেও তখনো সদা পিতার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের একজন সদস্যই থেকে যায়! আশ্চর্য! অভিজাত পোশাক পরিহিত লম্বা-চওড়া একজন তাগড়া যুবক, কিন্তু এক পয়সারও মালিক হয় না! অথচ আগেকার যুগে, অর্থাৎ, ষাট/সত্তর বছর পূর্বে বিশ বছর বয়সের একজন যুবক রুজি, পেশার অধিকারী ও কতগুলো সন্তানের জনক হতো! আর যদি সে বিয়ের জন্য অর্থ-কড়ি পেয়েও যায়, তা হলে তার পিতা কি তাকে বিয়ের সুযোগ দিয়ে বসবে?' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৪)-অনুবাদক]*

দ্বিতীয় কারণ হলো, বিয়ে-শাদিতে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার। এই কুসংস্কারগুলো একসাথে ছেলে ও মেয়ের পিতার পরিবারকে ধ্বংস করে ছাড়ে। আমি আগেও বলেছি, এতে কারও জন্য কোনো কল্যাণকর বিষয় থাকে না। এসব আয়োজন-অনুষ্ঠান করা হয় শুধু মানুষের সামনে অহমিকা প্রদর্শন ও অপচয়-অপব্যয়ে প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের জন্য। যেমন মোটা অংকের মহর নির্ধারণ, দামি দামি সরঞ্জামাদি কেনাকাটা করতে প্রতিযোগিতা করা, যেগুলোর কোনো প্রয়োজনই নেই, যেগুলোর কোনো আবশ্যকতাও নেই। আমি অনেক বিলাসবহুল বাড়ির কামরায় প্রবেশ করেছি। সেখানে আমি দেখতে পেয়েছি উপহার, পুতুল, নকশাদার কাপড়/পর্দা, ফলক ইত্যাদি দামি দামি বস্তু স্তূপাকারে অগোছালোভাবে অরুচিকর

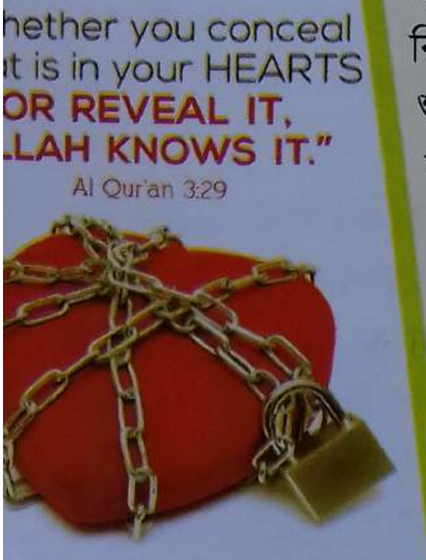

অবস্থায় পড়ে আছে। এমনকি অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন এই কামরাগুলো গাদাগাদি করে সরঞ্জামাদি রাখার কামরা; অভ্যর্থনা কক্ষ নয়। অথচ এ ক্ষেত্রে আমরা যে সকল বিদেশির অনুকরণ করি, তারা অভ্যর্থনাকক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু রাখে না। আর তারা যদি কখনো সাজসজ্জার ইচ্ছা করে, তা হলে মূল্যবান, শৈল্পিক কারুকার্যখচিত ফলক লটকে রাখে। স্মৃতিস্বরূপ একটিমাত্র উপহার রাখে। তাদের ঘরে তুমি মোটা, দামি, বাঁধাই করা কোনো ফ্রেম দেখতে পাবে না, যেখানে কোনো যৎসামান্য নির্বোধের ছবি বিদ্যমান। তুমি তাদের ঘরে এসব চিনামাটির বাসন, সৌন্দর্যের গাঢ় পাত্র ও সুগন্ধির কাচের পাত্র, যেগুলো কখনো ধরাছোঁয়া হয় না বা ব্যবহারে আসে না, তা দেখতে পাবে না। তারা সাধারণত কোনো বস্তুর ধাতুর চেয়ে রুচি ও চাকচিক্যের মূল্য দিয়ে থাকে।

এই যে যে ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালা, যেমন : খুতবা ও আংটি পরানোর অনুষ্ঠান, আক্বদের অনুষ্ঠান, বিয়ের জামা পরানোর অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান, পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই শত জনকে শতকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন টাইপের মানুষকে একত্র করে, যাদের পারস্পরিক মতের কোনো মিল নেই। নেই কোনো ভালোবাসা। অনেক সময় এদের মাঝে কোনো পূর্ব দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত থাকে না।

এসব অনুষ্ঠান পুরুষদের জন্য চিৎকার, চেঁচামেচি ও অভিযোগ। অথবা বোঝা বা নিশ্চুপতা কিংবা মনের নীরব দহন-পোড়ন। নারীদের জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুষ্ঠান। প্রত্যেকেই নিজের পোশাকের প্রশংসা করে আর অপর মহিলার পোশাকের খুঁত বের করে!

এখানেই শেষ নয়, এসব অনুষ্ঠানাদির সাথে রয়েছে এমন-সব উপহার-উপঢৌকন, যেগুলো অনেক সময় অনুষ্ঠানের ধরন ও সমমূল্যের হয়ে থাকে; বরকে মহরের চেয়েও বেশি খরচ করতে বাধ্য করে। কনের পিতাকে বরের খরচের মতো যৌতুক দিতে বাধ্য করে। এসব অনুষ্ঠান প্রত্যেক ওই পুরুষের জন্য একটা আপদ, যার স্ত্রী বা কন্যাকে এসব অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়। কেননা, তখন বাধ্য হয়ে তাকে নতুন পোশাক কিনতে হয় সেই টাকা দিয়ে, যেই টাকা সে সঞ্চিত করে রেখেছিল পরিবার-পরিজনের ডাল-ভাত কেনার জন্য।

যখন আমি ইন্দোনেশিয়ার 'জাওয়া' দ্বীপে ছিলাম, তখন সেখানকার অধিকাংশ যুবককেই বিবাহিত পেয়েছিলাম। তাদের কাছে বিয়ের রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। আমি জানতে পারলাম, তাদের দেশে এটা একেবারেই সহজ ও স্বাভাবিক। আমাদের দেশের বিয়ের প্রথাগত কাঠিন্য এবং আনুষ্ঠানিকতার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে তাদের জানালাম। এই পরিস্থিতির কারণে বৈধ পন্থায় বিয়ে করার চেয়ে শত বার অবৈধ পন্থায় যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করা সহজ আকার লাভ করেছে। (আমি তাদের এ কথা বলছিলাম আর মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলাম) পিতারা এই অশুভ দিকটার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং তারা এই অশুভ কাজকে আরও সুগম করে দিচ্ছেন। আর তা এভাবে যে, তারা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় ও চরিত্রগত দীক্ষার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আবার বিয়ের বিষয়টাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখার সাথে সাথে বিয়ে প্রার্থীর সামনে কত শত বাধা ও কাঁটা দাঁড় করিয়ে রাখেন।

তৃতীয় কারণ হলো, অধিকাংশ স্বামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা জানে না। যার ফলে স্বামী তার ওপর স্ত্রীর হক সম্পর্কে কিছুই জানে না বিধায় তা আদায় করে না। তদ্রূপ স্ত্রী তার ওপর স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানে না বিধায় তা আদায় করেন। যার কারণেই বেশির ভাগ দম্পতির ঘরে ঝগড়া-বিবাদ আর মনোমালিন্য দেখা দেয়। তাদের দাম্পত্যজীবন হয়ে ওঠে অসহনীয় জাহান্নাম। অবিবাহিত যুবকেরা তা দেখতে ও শুনতে পায়, ফলে তারা বিয়েবিমুখ হয়ে ওঠে। বিয়েকে অপছন্দ করে।

চতুর্থ কারণ, নৈতিক অবক্ষয় আর চারিত্রিক স্খলন। নৈতিক অবক্ষয় মূলত বিয়ে হ্রাসকরণের ফল। বিয়েস্বল্পতারই একটি কারণ। বিষয়টা ওই চক্রাবর্তনের মতো, যাকে তর্কশাস্ত্রবিদরা সমর্থন করেননি আর কবিরা সমর্থন করেছেন। যেমন এক কবি বলেছেন–

আমরা যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন-দুজনা, এসেছে আমাদের মাঝে চক্রাবর্তন-বিড়ম্বনা।

যদি আমার কৃষ্ণকেশে স্পর্শ করত না শুভ্রতা, প্রেমিকা মোর অবলম্বন করত না কোনো বক্রতা। যদি বক্রতা অবলম্বন করত না মোর প্রিয়া সে, ছেয়ে যেত না কভু শুভ্রতা আমার কৃষ্ণকেশ্লে।

যে যুবক বিয়ের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে বিয়ের প্রয়োজনকে ব্যভিচারের মাধ্যমে পূরণ করে নেয়। আর ব্যভিচারের সহজলভ্যতাই তাকে বিয়ে থেকে বিমুখ রাখে। সুতরাং তার কেনই-বা দরকার বিয়ের এবং এসব খরচপাতির আর প্রতিবন্ধকতার? কেনই-বা তার দরকার স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের, অথচ সে তার চাহিদাকে এসব ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে সক্ষম?

এখানে আমি আবারও বলব, বিয়ের জটিলতা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যভিচারের জটিলতা এক ও অভিন্ন। দুটির একটি ব্যতিরেকে অপরটির চিকিৎসা সম্ভব নয়।

পঞ্চম কারণ হলো, এ রচনার শুরুতে আমি যে বিষয়ের আলোকপাত করেছি, তার ফলাফল। আমি কি আপনাদের সেখানে বলিনি, বিয়ের জটিলতাই হাজার হাজার যুবতীদের বিয়েবিহীন অনূঢ়া ও হাজার হাজার যুবকদের বিয়েবিহীন অনূঢ় থাকার কারণ?

যুবকদের মাঝে বিভিন শ্রেণি ও স্তর রয়েছে। ধনী-গরিব, সভ্য-মূর্খ, পাপাচারী-মুত্তাক্বী, বাস্তববাদী-কৌতুকপ্রিয়। ঠিক তদ্রূপ মেয়েদের মাঝেও এ রকম শ্রেণি ও স্তর রয়েছে। তাই কোনো যুবক যখন বিয়ে করতে চায়, তখন সে যদি তার চিন্তা-চেতনা, সামাজিক অবস্থান ও নিজ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিয়ে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিত, তা হলে আমরা সমাজে স্বামী-স্ত্রীর যে কলহ-বিবাদ আর মনোমালিন্য দেখতে পাই, তা মোটেও দেখা দিত না। আর বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী একদল সমাজ-সংস্কারক ও পাত্রীর সন্ধানদাতা লোকদের প্রয়োজন পড়ত না। এরপরও যদি দেশের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় এ ধরনের কিছু সমাজ-সংস্কারক লোক থাকত, তা হলে অবশ্যই এ ধরনের জটিলতা কিছুটা হলেও মিটে যেত।

সারকথা, সারাদেশেই বিয়ের জটিলতা বিদ্যমান। এই জটিলতা ব্যভিচার-সমস্যা ও

নৈতিক অবক্ষয় আর চারিত্রিক স্খলনের সাথে সম্পৃক্ত। একটির চিকিৎসা বাদ দিয়ে অপরটির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আর সর্বপ্রথম এর মূলে রয়েছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। এরপর সমাজে প্রচলিত মহর, উপহার-উপঢৌকন ও অনুষ্ঠানাদির প্রথা ও ওইসব রীতিনীতি, যা বহন করা কষ্টকর হয়। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর শরয়ী আহকাম বর্জন করা। যার ফলে তাদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার পরিবর্তে ঝগড়া-বিবাদ আর মনোমালিন্য লেগেই থাকে। এরপর বিয়ের জন্য তৃতীয় পক্ষ ব্যতিরেকেই যুবকের নিজ খেয়াল-খুশি মতো তার অনুপযোগী ও অনুপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে করা ও মেয়ের গুণের পরিবর্তে সৌন্দর্যকে, দ্বীনের বদলে সম্পদকে এবং চরিত্র ও নৈতিকতার ওপর বাহ্যিক বেশভূষা ও চাকচিক্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

এ বিষয়ে আমার আরও কিছু কথা বলার আছে, ইনশাআল্লাহ।

[সূত্র : মা'আন নাস, পৃষ্ঠা : ৮৬]

জটিলতার কারণ

(১৯৫৮ সালে প্রকাশিত)

আমার সামনে এ মুহূর্তে দুটি পত্র রয়েছে। একটি জনৈক চাকরিজীবী যুবকের। অপরটি এক অবিবাহিতা যুবতীর। প্রথম পত্রটি আমাদের দেশের বড় বড় সামাজিক জটিলতা; বরং বলতে গেলে সবচেয়ে বড় জটিলতার দিকে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় পত্রটি উক্ত জটিলতা সমাধান বাতলে দেয়। যদি আমি সময় নির্ধারণ করতাম এবং মাধ্যম ঠিকঠাক রাখতাম, তা হলে পত্র দুটি একই সাথে কাকতালীয়ভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছাত। আমি আবারও বলছি, পত্র দুটি আমার সামনে রয়েছে। সুতরাং আপনারা এই ধারণা করবেন না যে, আমি আন্দাজ করে কথা বলছি। উভয় পত্রতেই নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে, কিন্তু আমি কখনো এর কিছুই উল্লেখ করব না।

প্রথম চিঠিতে লেখক বলছেন, তিনি একটি ছোট্ট চাকরি করেন। মাসিক দুই শ লিরা বেতন পেয়ে থাকেন। তিনি বংশগতভাবে সম্ভ্রান্ত। সুন্দর গঠন ও অবয়বের অধিকারী। তিনি বিয়ের মাধ্যমে চরিত্রকে হেফাজত করতে এবং ঘর-সংসার করতে চান। তাই এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়েপক্ষ তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করল, খোঁজখবর নিল। তারা তার দৈহিক গঠন ও দ্বীনদারীর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। কিন্তু আপত্তি করে বসল যে, ছেলে সামান্য বেতনে চাকরি করে।

এরপর দ্বিতীয় আরেকটি মেয়েকে প্রস্তাব দিলেন। সাথে তাদের এও বলে দিলেন যে, তিনি কম বেতনে চাকরি করেন। জবাবে তারা বলল যে, 'বেতন দিয়ে কী হবে? এটা কি বেচাকেনা যে, ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে? আমরা ধন-সম্পদের বিবেচনা করি না।' এতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, যাক এখানে এসে সৌন্দর্য হাতের মুঠোয় ধরা দিল! বিষয়টা শেষ প্রান্তে এসেছিল প্রায়, যদি-না তারা বলত যে, ছেলে সুন্দর নয়। অথচ তিনি সুন্দর। (পত্রলেখক নিজের ব্যাপারে সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমি নয়। আমি তাকে দেখিনি। তার চেহারা সম্পর্কে আমি জানিও না)।

এরপর তৃতীয় আরেক জায়গায় প্রস্তাব পাঠালেন এবং তাদের প্রথমেই বলে দিলেন, আমরা কোনো প্রকার জটিলতা, শর্তারোপ, অনুষ্ঠান-আয়োজন কিছুই

করতে পারব না। আমি একজন ছোট্ট চাকরিজীবী। বেতন পাই সিরিয়ান দুই শ লিরা মাত্র। আর আমার চেহারা-সুরত, এ তো আপনাদের সামনেই উপস্থিত। তারা বলল, 'আমরা আপনার চেহারা-সুরত ও বেতনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে মেয়ের বড় বোনের মহর ছিল চার হাজার লিরা। আমরা আমাদের ছোট বোনের মহর তার চেয়ে কম নির্ধারণ করতে পারব না।' তিনি চার হাজার লিরার কথা শুনে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম।'

এরপর চতুর্থ আরেকটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়েপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে, আমার বেতন এত ও আমার চেহারা-সুরত এমন। আমি এক হাজার লিরা থেকে বেশি মহর দিতে পারব না। তারা বললেন, 'আমরা মেনে নিলাম। আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' কথাবার্তা, আলোচনা প্রায় শেষ এমন সময় তারা বলে উঠল, 'আপনার স্ত্রীর জন্য একটা আলাদা বাসা ভাড়া নেবেন ও শোবার কামরাটাকে বিছানাপত্রে সজ্জিত করবেন। এ-ই যথেষ্ট।' তিনি তাদের এই আবেদনকে মহরের চেয়েও আরও ভারী পেয়ে সেখান থেকে আলগোছে কেটে পড়লেন।

সর্বশেষ পঞ্চম আরেকটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি সবকিছু খুলে খুলে বর্ণনা করলেন। তারাও সবকিছু মেনে নিল। মেয়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করল। তিনি মেয়েকে গ্রহণ করতে পয়সা-কড়ি সঞ্চয় করলেন। বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন হলো। কিন্তু হাটে এসে হাড়ি ভাঙার মতো শেষমুহূর্তে এসে মেয়েপক্ষ সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে বসল! কারণ, ছেলের মা ছিলেন একজন গ্রাম্য মহিলা। অনুষ্ঠানের নিয়মনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি অপমানজনক এক বিরাট অপরাধ করে বসলেন। তিনি খুতবা পড়ার অনুষ্ঠানে গোশতে ব্যবহৃত চামচকে তরমুজ খাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বসলেন! তরকারির ঝোল জোরে আওয়াজ করে পান করলেন! হাতে ধরে রেখে আপেলের খোসা ছাড়ালেন!

লেখক গ্রাম্য এই মায়ের আরেকটি অপরাধ এর কথা লিখতে ভুলে গেছেন। যখনই তিনি খাবার চিবুচ্ছিলেন, তখন তার থুতনি নাড়াচ্ছিলেন...।

পরিশেষে তিনি বিয়ের চিন্তাই ছেড়ে দিলেন। নারীদের অপছন্দ করতে শুরু করলেন। এমনকি তিনি সন্দেহপ্রবণ লোক হয়ে পড়লেন। তিনি তার পত্রের ইতি টেনেছেন মেয়েদের ও তাদের বাবাদের কিছু শ্রুত, গরম গরম গালি দিয়ে। (আফসোসের বিষয়, আমিও তাদের একজন এবং এই সমাজের সব লোকই)!

দ্বিতীয় পত্রের লেখিকা বলছেন, তিনি তিন উবর্শী যুবতী বোনের একজন। তারা তাদের বড় ভাইয়ের কুটিরে জীবনাতিপাত করেন। তিনি তাদের ওপর খরচ করতে কোনো কমতি করেন না। কিন্তু যখনই কোনো ব্যক্তি তাদের কাউকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই লোকটা কৃপণ স্বভাবের, তার সাথে বিয়ে দিলে বোনকে কষ্ট দেবে। ওই লোকটা মূর্খ, বোনের অনুপযুক্ত। অথচ লোকটা মর্যাদাবান আলেম। এই লোকটার পরিবার অচেনা-অজানা। ওই লোকটা আত্মীয়-স্বজনহীন। যখন কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দেবে, তখন সমাধানের জন্য তার পরিবারের কাউকে পাওয়া যাবে না। আবার এই ব্যক্তির পরিবারের সদস্য-সংখ্যা অনেক। ঘরে তার মা, বোন, বউ ও ভাই আছে। তারা সকলে বোনকে নির্যাতন করবে বলে ভয় করেন। তা ছাড়া কেউ প্রস্তাব নিয়ে এলে এবং তার মাঝে কোনো দোষ খুঁজে না পেলে বেচারার ওপর মোটা অঙ্কের মহর সাব্যস্ত করেন। চাপিয়ে দেন অনেক অপ্রয়োজনীয় বোঝা। পত্রের মধ্যে যুবতী আমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছে। এ সংকট থেকে পরিত্রাণ খুঁজছে। সে ভয় করছে, তার ব্যাপারে এ বিষয়টা লোকমুখে চলে যাবে। ফলে তার আর কোনো বিয়ের প্রস্তাব আসবে না এবং সে জীবনভর অনূঢ়া হয়ে থাকবে।

পাঠক-পাঠিকা, এই হলো দুটি পত্রের ভাষ্য। এটাই আমাদের সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ঘরে উবর্শী যুবতীরা বিদ্যমান। বিয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনে চলেছে। তদ্রূপ ঘরে ঘরে অবিবাহিত যুবকরা

বিদ্যমান। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফিরছে। বিয়ে করতে চায়। কিন্তু দু-দলের মাঝে এমন মজবুত দেয়াল অন্তরায় হয়ে আছে, যা তাদের হালাল পন্থায় মিলনের পথে বাধা দিচ্ছে। তবে অবৈধভাবে? সেখানে কোনো বাধাবিপত্তি নেই! আর এই অন্তরায় হচ্ছেন পিতারা। ক্ষমা করবেন আমি সব পিতাদের উদ্দেশ্য করছি না। বরং যারা এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, জগতে এখন ধ্বংসাত্মক মহামারি চলছে। যে মহামারি নৈতিকতা-চরিত্র, ইজ্জত-আব্রু সব ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। এই মহামারির কোনো ওষুধ নেই, এ থেকে বাঁচার কোনো উপায়ও নেই। একটিমাত্র পথ খোলা। সেটি হচ্ছে বিয়ের দরজা। যে ব্যক্তি বিয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বা বিয়েতে শর্তারোপের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করে কিংবা সহজভাবে কার্যসম্পাদন করার সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও সহজায়ন করে না, তিনি এই সমস্যার অন্যতম ভূমিকা পালনকারী। উভয় দিকে অসুবিধা থাকলেও মেয়ের দিকে অসুবিধাটা একটু বেশি। কারণ, যুবক অপরাধ করে খালাস হয়ে যায় কিন্তু যুবতী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। তা ছাড়া সমাজও যুবকদের ক্ষমা করে দেয়। তাদের বেলায় বলে, আরে একটা ছেলেমানুষ। কিছু একটা দোষ না হয় করে ফেলেছে। তাওবাও করে নিয়েছে। কিন্তু মেয়ের বেলায় তারা কখনো ক্ষমা করে না। তার তাওবাও কবুল করে না!

[শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, 'এ ক্ষেত্রে বলির শিকার হয় একজন মেয়ে। তার কাছে একজন যুবক আসে, অতঃপর সেই মেয়েকে তার সরলতার সুযোগে পুঁজি করে অবৈধ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। একসময় যখন উভয়েই ক্ষণিকের স্বাদ আস্বাদন করতে গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে; যুবকটি চুপিসারে ভালো ভালো কেটে পড়ে, আর যুবতীকে একাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পেটে বোঝা, ললাটে কলঙ্কের তিলক এঁটে বেড়াতে হয়! যুবকটি তার অপকর্ম থেকে তাওবা করে নেয়, সমাজও তার অপরাধকে ভুলে যায় এবং তার তাওবাকে কবুল করে নেয়! এদিকে যুবতীটিও

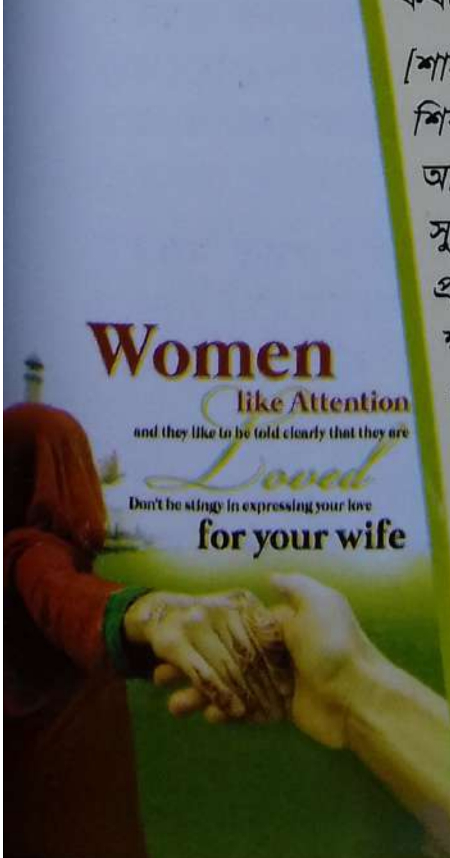

তাওবা করে, কিন্তু এই জালিম সমাজ তার তাওবা কবুল করে না! অতঃপর যখন এই যুবক বিয়ে করতে চায়, সে এ যুবতী থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা প্রদর্শন করে, যাকে সে নিজেই বানিয়েছে নষ্টা-ভ্রষ্টা!'

(ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৩)-অনুবাদক]

মেয়ের পিতা যদি জ্ঞানী হয়, তা হলে সে তার মেয়ের বিয়ের জন্য চেষ্টা করে। না, সে তার মেয়েকে মানুষের সামনে পণ্যপ্রদর্শন করতে পারবে না। আর তাকে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব পেশকারী ছেলের সাথে বিয়ে দেবে না। বরং শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করবে। ছেলের দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। যদি তার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়, তা হলে তার পরিবার, পরিবারের সদস্যদের স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার দিকে দৃষ্টিপাত্র করবে। যদি ছেলে ও তার পরিবার মেয়ে ও মেয়ের পরিবারের উপযোগী হয়, ধন ও দরিদ্রতা, স্বভাব ও অবস্থানের দিক দিয়ে পাশাপাশি হয়, ছেলে যদি মেয়েকে তার বাপের বাড়িতে যেভাবে জীবনযাপন করেছে সেভাবে রাখতে পারে, তা হলে মেয়ের পিতা বিয়ের প্রস্তাব পেশকারী ছেলেকে কবুল করবে। আর মহর তো হলো একটি অপরিহার্য বিষয়। তবে তা মধ্যম পর্যায়ের হতে হবে। *[বিয়ের মধ্যে মহর কম হওয়ার ব্যাপারে বেশ ক'টি হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কতগুলো হলো–*

** হযরত উক্বা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম বিয়ে হলো যা সহজ হয়।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২১৭, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. হাদীসটাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য : সহীহুল জামে, ৩৩০০)*

** হযরত উক্বা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম মহর হলো যা সহনীয় হয়।' (সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং : ১৪৭২২১, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে 'সহীহ' সাব্যস্ত করেছে। দ্রষ্টব্য : সহীহুল জামে, ৩২৭৯)*

** হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহিলার কল্যাণকর বিষয়াবলির মধ্য থেকে হলো তার বিয়েকে সহজ করা, তার মহরকে সহজ করা ও তার রেহেমকে সহজ করা।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ২৩৯৫৭, ইবনে হিব্বান, হাদীস নং: ৪০৯৫,*

হাদীসটিকে শাইখ আলবানী 'হাসান' সাব্যস্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য : সহীহুল জামে, ২২৩৫)

* বিয়ে করতে ইচ্ছুক এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মহরের জন্য কোনো কিছু তালাশ করো, লোহার একটি আংটি হলেও।' (বুখারী, মুসলিম)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রা. বলেছেন, 'আমি ফাতেমা রা. কে বিয়ে করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, ফাতেমার সাথে আমার নিশিযাপনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাকে মহর হিসাবে কিছু দাও। আমি বললাম, আমার কাছে তো কিছুই নেই। তা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার হুতামী বর্মটা কোথায়? আমি বললাম, সেটা আমার কাছেই আছে। তিনি বললেন, তা হলে সেটাই তুমি ফাতেমাকে দাও।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২১২৫ ও সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং : ৩৩৭৫। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন)

* হযরত আবুল আজফা আস-সুলামি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. আমাদের বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদের জন্য মোটা অঙ্কের মহর নির্ধারণ কোরো না। কেননা, যদি মোটা অঙ্কের মহর দুনিয়াতে কোনো সম্মানের বিষয় হতো বা আল্লাহর কাছে তাকওয়ার কোনো ব্যাপার হতো, তা হলে নিশ্চয় এটার ব্যাপারে তোমাদের থেকে অধিক হকদার ও উপযোগী হতেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোনো স্ত্রীকে, তদ্রূপ তাঁর কোনো মেয়ের বিয়েতে বারো 'উক্বিয়া'র চেয়ে বেশি মহর দেননি। একজন পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য মোটা অঙ্কের মহর সাব্যস্ত করে, কিন্তু পরে এটার জন্য তার অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং সে বলে, তোমার জন্য আমি মশক বাঁধার দড়িটাও বহন করতে হয়েছে!' (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮৮৭, হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য : সহীহু ইবনি মাজাহ, ১৫৩২। উল্লেখ্য, এক উক্বিয়া চল্লিশ দিরহামের বরাবর হয়। বারো উক্বিয়া চার শ আশি দিরহাম হয়। আবার এক দিরহামের ওজন হয় ২.৯৭৫ গ্রাম)

* শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি চায়, তার মেয়ের

বিয়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যে সকল মেয়েদের বিয়েতে যে অঙ্কের মহর দিয়েছেন, যাঁরা হলেন দুনিয়ার মধ্যে প্রতিটি ফজীলতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিটি ভালো গুণের মধ্যে দুনিয়ার সব নারীদের চেয়ে সর্বোত্তম, তার চেয়েও আরও বড় অঙ্কের মহর হবে, ওই ব্যক্তি হলো নির্বোধ, আহমক!' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩২/১৯৪)-অনুবাদক] যাতে ছেলের ওপর বোঝা না হয় আবার মেয়ের হকও নষ্ট না হয়। যদি বিয়ের প্রস্তাব পেশকারী ছেলে সৎকর্মশীল হয় আর অধিকাংশ যুবকদের মতো তার হাতে নগদ তেমন টাকা-পয়সা না থাকে, তা হলে মহর যেন বাকিতে পরিশোধযোগ্য হয়। যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দেন এবং সে বেঁচে থাকে, তা হলে মহর বাকি হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

মহর তো একটি আবশ্যক বিষয়। আর যে সমস্ত বিষয় আবশ্যক নয়, আবার আকাঙ্ক্ষিতও নয়; বরং বিয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে, বিয়েকে জটিল ও কঠিন করে ফেলে, সেগুলো হচ্ছে বিয়েতে প্রচলিত অনুষ্ঠান-আয়োজন। এসব কুসংস্কারের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। এগুলোর কুফল মেয়েদেরই বয়ে বেড়াতে হয়। এসবের জন্য অভিভাবক জবাবদিহি করতে হবে। আমি বলব, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যা কিছুই উপকারে আসে, তা গুরুত্ব দিতে হবে। আর যা তাদের জীবনে কোনো উপকারে আসে না এবং যার উপকার সাত দিনের বেশি স্থায়ী হয় না, তার ব্যাপারে আমি অনুমোদন দিতে পারব না।

এসব অনুষ্ঠান-আয়োজনের ব্যয়ভার মহরের চেয়েও বেশি হয়। কখনো বিয়ে করতে ইচ্ছুক যুবক আবার কখনো মেয়ের পিতার জন্য বোঝা হয়ে ওঠে। অনেক সময় উভয়ের পরিবারকে ধ্বংস করে ছাড়ে। বিয়ের আকদের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কারণ, এটা সুন্নত। কিন্তু সমস্যা হলো কাপড়চোপড় আর পোশাক-পরিচ্ছদে। আমি পাঁচ বছর ধরে এক স্যুট পোশাক পরে বিশটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। অথচ একজন মা

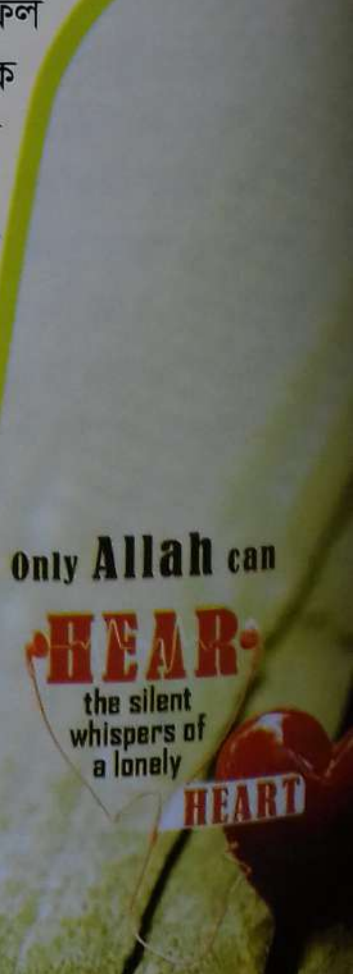

তার প্রথম মেয়ের বিয়েতে ব্যবহৃত পোশাক পরে তার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না! হায়রে লজ্জা! কীভাবে মানুষ তাকে এক পোশাকে দুই বার দেখবে? একই অবস্থা বোনের, ফুফুর, চাচাতো বোনের, চাচির বোনের, মামির ননদের। এরা সকলেই নিজেদের স্বামীদের বিয়ের অনুষ্ঠানে নতুন কাপড় কেনার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। একটা অনুষ্ঠান চল্লিশটা পরিবারের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় তো স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনকেই নষ্ট করে দেয়।

এ তো গেল একটি অনুষ্ঠানের কথা। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হলো ফুল সাজানো। দামেশকের একটা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি জানি। সেখানে দুই হাজার লিরা দিয়ে শুধু ফুলের আয়োজন করা হয়েছিল। বাস্তবেই দুই হাজার লিরা। আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন সেখানকার অবস্থা কী হয়েছিল? ফুলগুলোতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, ফলে একটির ওপর আরেকটি রাখা হয়েছিল। পরে এগুলো সরিয়ে নিয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে 'তানবার' নামক গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল! দুই হাজার লিরা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হলো। অথচ শহরে হাজারো এমন পরিবার রয়েছে, যারা মাত্র এক লিরার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে।

তৃতীয় কারণ হলো, জামা-কাপড় রাখার বক্স। একটি বক্সের দাম কম করে হলেও পাঁচ থেকে সাত পিয়াস্টার। কোনোটার মূল্য পাঁচ লিরা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কৌটা ভর্তি করে দেওয়ার পারিশ্রমিক আবার অর্ধেক লিরা। তা হলে চিন্তা করুন, মধ্যপন্থার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে, যেখানে অতিথির সংখ্যা হয় পঞ্চাশ থেকে এক শ– কী পরিমাণ পয়সা খরচ করা হয় শুধু এই বক্সের পেছনে! এই অবস্থা কেবল আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয় ও আয়োজনের ব্যাপারে। আমি সেসব অনুষ্ঠানাদির কথা আর না-ই বা উল্লেখ করলাম, যেগুলো ক্লাব ও উন্নতমানের হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেগুলোতে অতিথি-সংখ্যা হয়ে থাকে কয়েকশ।

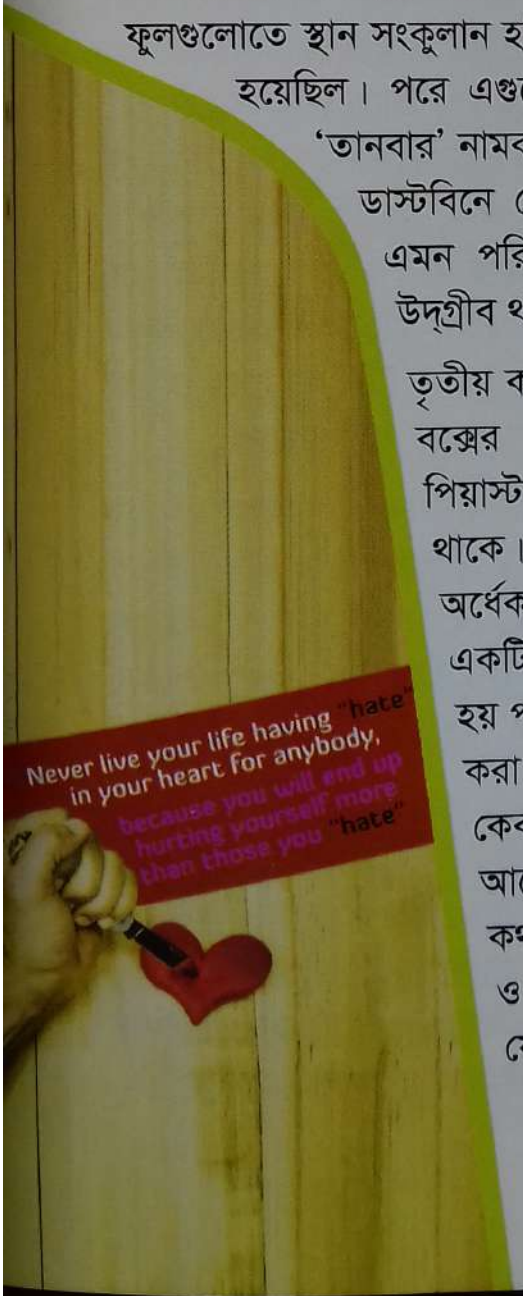

যেগুলোতে এতই অপচয়-অপব্যয় আর সম্পদ নষ্ট করা হয় যে তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

বিষয়টা কেবল এই অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, এ ছাড়াও রয়েছে বউ-ভাত এবং এমন-সব উপহার-উপঢৌকন, যেগুলো বউ-ভাতের অনুষ্ঠানে পেশ করা শর্ত করা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য উপহার-উপঢৌকন, এটাই সর্বশেষ আপদ। এসব পেয়ে আপনি বেশ খুশি হবেন। এ সময়ে আপনি এত উপহার পাবেন, যেগুলোর আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই। যেগুলো আপনার কোনোই উপকারে আসবে না। উপহারস্বরূপ আপনার কাছে আসবে দশটি ঝাড়বাতি। যদি আপনি এগুলো বিক্রি করতে চান, তা হলে মানুষ আপনাকে লজ্জা দেবে! তা হলে এসব দিয়ে আপনি কী করবেন? কিছুদিন পর হঠাৎ করেই আপনার কাছে এসবের ঋণ পরিশোধ করার তাগদা আসবে। অনেক সময় তুমি টেনেটুনে হলেও তোমার খরচের জন্য পয়সা-কড়িকে অঙ্ক কষে হিসাব করে রেখেছ, তো হঠাৎ করেই তোমার কাছে দাবি আসবে যে, তোমাকে এক হাজার লিরা দিতে হবে অমুকের মেয়ের বিয়ের উপহারের মূল্য বাবদ! আপনি বলবেন, অমুকের বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ের কারণে আনন্দের ধুমধাম চলছে, তাই বলে কি এটা অপরিহার্য করে যে আমার ঘরে দুঃখের মাতম চলবে আমার হিসাবকরা গাঁটের পয়সা-কড়িকে হেরফের করার মাধ্যমে? আপনার স্ত্রী এসে বলবেন, ভুলে যাননি তো, উনি আমাদের মেয়ের বিয়েতে অনেক মূল্যবান চাইনিজ ফুলদানি উপহারস্বরূপ দিয়েছেন?

আপনি বলবেন, আমি কি তার কাছে চেয়েছিলাম যে সে আমার মেয়ের বিয়েতে অনেক দামি চাইনিজ ফুলদানি উপহার দেবে? ওটা আমার কীই-বা কাজে এসেছে? তাও ওটা আমার বাড়িতে নেই, মেয়ের বাড়িতে পড়ে আছে! যদি বা আমাদের এখানে থাকত, তা হলে সবসময় ভয়ে বুক দুরু দুরু করত, না জানি কখন ঘরের পরিচারিকা এটার সাথে হোঁচট খায় অথবা আমাদের সন্তান এটাকে ছুঁড়ে মারে আর ভেঙে যায়!

কিন্তু স্ত্রী বলবে, এটা দিতেই হবে। নইলে শরম!

এভাবে আপনাকে উৎপীড়ন করতেই থাকবে। কান দুটো বিদীর্ণ করে ছাড়বে। একপর্যায়ে আপনি মেনে নিতে বাধ্য হবেন। সমর্থনের সাদা নিশান উড়িয়ে দেবেন। এবং বলবেন, 'এই নাও পরিবারের খরচের জন্য জমাকৃত টাকা। উপহার খরিদ করে আনো। আর বিবেক-বুদ্ধিকে জানাই সালাম!'

এসব অনুষ্ঠান আর উপহার, যেগুলোর জন্য জিদ ধরে মেয়েদের মায়েরা এবং ওইসব আহমকি, যা অনেক পিতার মাথায় সওয়ার হয়- জটিলতার অন্যতম কারণ।

যদি আমরা এ ধরনের বড় বড় আয়োজন বর্জন করে নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম, এবং দামি দামি বস্তু উপহার দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম : যেমন বিছানার চাদর, যা সারা বছর পাঁচ বারও ব্যবহার হয় না। সর্বনিম্ন বিছানার চাদরের মূল্য এক শ লিরা থেকেও বেশি। আর সর্বোচ্চটির মূল্য থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! যদি আমরা জ্ঞানী হতাম, তা হলে বিয়ের কাপড় থেকেও আমরা অমুখাপেক্ষী হতাম, যা মাত্র কয়েক দিন পরা হয় অতঃপর আলমিরায় ফেলে রাখা হয়। যেমন কঙ্কালকে মেডিক্যাল কলেজে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কী দরকার মাত্র কয়েক দিনের জন্য এত মূল্য দিয়ে জামা-কাপড় ক্রয় করার? কারও থেকে ভাড়া বা কর্জ ও তো নেওয়া যায়!

আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমাদের দেখা উচিত, এ সমস্ত খরচপাতির মধ্যে কোনটি বর-কনের পারিবারিক জীবনে প্রয়োজনীয় এবং তারা কোন কোন বস্তুর মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম, তা কবুল করব। আর যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যই লোক-দেখানো, যেমন : বাসরের কাপড়, বিছানার চাদর, ফোলের তোড়া, স্যুটবক্স– এসব পরিহার করব। আমাদের প্রত্যেকেই চায় যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক। কিন্তু সামান্য প্রশংসাবাক্য যেমন : 'মাশাআল্লাহ!' 'সুন্দর বস্তু!'- ইত্যাদি শোনার জন্য এক হাজার লিরা খরচ করে ফেলা একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। কারণ, এই বাক্যাবলির মূল্য এর চেয়েও কম।

সর্বশেষ কথা হলো, প্রথম পত্রটির লেখায় অনেকটা বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। যদি তিনি নিজের উপযোগী এমন কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন, যাকে তিনি আগে থেকেই চেনেন এবং তারাও আগে থেকেই তার সম্পর্কে চেনে-জানে, তা হলে অবশ্যই তারা তাকে ফিরিয়ে দিত না এবং তারা তার সম্পদ, তার চেহারা-সুরত ও তার মাতা-পিতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উঠাত না। আর যে যুবতী মেয়েটি আমার কাছে দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছে, সে যদি উপযুক্ত ছেলে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসার পর আদালতে বিচারকের কাছে বিষয়টি পেশ করত, আর বিচারক যদি ছেলেটির উপযুক্ততার ব্যাপারে আশ্বাসী হতেন এবং মেয়ের অভিভাবকের গোঁড়ামি বুঝতে পারতেন, তা হলে অবশ্যই যুবতীকে ওই ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন অভিভাবকের নারাজি সত্ত্বেও।

পাঠকবৃন্দ, বিয়ের জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যা উল্লেখ করলাম, এ থেকে উত্তরণের একটাই পথ- বিয়েকে সহজ করা। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি বিয়ের জন্য চেষ্টা চালায় এবং তা পূর্ণতাসাধনের জন্য কাজ করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কল্যাণ ও ভালো কাজের চেষ্টাকারী। সম্মান ও মহত্ত্বের জন্য শ্রম ব্যয়কারী। এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ও দেশের সেবায় নিয়োজিত একজন।

যে ব্যক্তির ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে, তাকে বলি, যখন কোনো উপযুক্ত ছেলে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেবেন না এবং তার ওপর অনেক চাওয়া-পাওয়ার বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। *[হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আগমন করবে, যার দ্বীন, চরিত্র ও আমানতদারির ওপর তোমরা সন্তুষ্ট হও, তা হলে তার সাথে তোমাদের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দাও। অন্যথায় দুনিয়াতে ফিতনা ও ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি হবে।' (সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুস্তদরাকে হাকিম। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী 'হাসান' বলে সাব্যস্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য : সহীহু সুনানিত-তিরমিযী, ১/৩১৫)-অনুবাদক]*

আর হে যুবকেরা, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করে ফেলুন। কারণ, ফরজ আদায় ও হারাম থেকে বাঁচার পর বিয়ের চেয়ে আর কোনো নেক আমল দ্বারা আপনারা আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবেন না। এর দ্বারা আপনারা আপনাদের চরিত্র ও দ্বীনকে হেফাজত করতে পারবেন।

[হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুব-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে যুব-সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা, বিয়ে চক্ষুকে অধিক অবনমিতকারী ও লজ্জাস্থানকে বেশি হিফাজতকারী। আর যে

বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, তার ওপর রোজা রাখা অপরিহার্য। কেননা, রোজা তার কাম-লালসাকে ভেঙে দেবে।' (সহীহ বুখারী, ৩/৪৪২)-অনুবাদক]

হে দেশের জ্ঞানীকুল, হে সংস্কারপন্থীগণ, হে কলমের অধিপতিরা, হে মিম্বরের খতীবগণ, বিয়েকে আপনাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হিসাবে সাব্যস্ত করুন। আল্লাহই আপনাদের তাওফীক দান করুন এবং অশেষ পুণ্য দিয়ে উত্তম বদলা দান করুন। *[সূত্র : মাআ'ন নাস, পৃষ্ঠা : ৮৭]*

ভালোবাসা ও বিয়ে
(১৯৬০ সালে প্রকাশিত)

এই সপ্তাহের ডাকে আমার কাছে একটি আশ্চর্যজনক চিঠি আসলো। যদি-না চিঠিটা লম্বা-চওড়া হতো, তা হলে আমি চিঠিটা সম্পূর্ণ এখানে উল্লেখ করতাম। তবে আমি চিঠির মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি। চিঠির প্রেরক চিঠিতে (তার কথানুযায়ী সে একজন ছাত্র) বলছে, কীভাবে সে তার প্রতিবেশীদের একজন মেয়েকে দেখতে পেল এবং তাকে তার ভালো লেগে গেল, অতঃপর যোগাযোগ করল ও গোপনে একাকী সাক্ষাৎ করল। সাক্ষাতে সে মেয়েটির ব্যাপারে তার আবেগ ও আসক্তির কথা প্রকাশ করল। সে মেয়েকে তার মনের মণিকোঠায় লালিত প্রেম ও গভীর ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিল। তারা উভয়ে বিয়ের করার ওপর একমত হয়ে গেল। অঙ্গীকারও করে নিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটির পিতা। তিনি মেয়েটিকে অধিক উপযোগী অন্য একটি ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এতে চিঠিতে প্রেরক নিজের বরবাদি, ধ্বংস ও নিঃস্বতার কথা উল্লেখ করে দারাজ কণ্ঠে হা-হুতাশ প্রকাশ করে চলেছে। সে মেয়েটির পিতাকে দোষী সাব্যস্ত করছে যে তিনি নাকি একজন অপরাধী, নির্দয়। হত্যাকারী, রক্তপ্রবাহকারী। দুটি অন্তরকে জখমি করতে ও দুটি মানুষকে হত্যা করতে এবং দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে মোটেও পরোয়া করেননি- এসব ছাড়াও আরও কিছু প্রলাপ, যা প্রেমিক যুবকরা করে থাকে!

আমি চিঠিটা হাতে নিলাম। আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম যে, কীভাবে মানুষের মধ্যকার বিষয়গুলো পাল্টাচ্ছে! বাস্তবতাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে! যার কারণেই তো প্রেরক যুবক হারাম বস্তুর ব্যাপারে তোমার ওপর উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তোমাকে অপবাদ দিচ্ছে যে তুমি নির্দয়। তুমি অপরাধী। তুমি হত্যাকারী, রক্তপ্রবাহকারী। কেননা, তুমি তার আশা ভঙ্গ করে দিয়েছ। তার অন্তরকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছ। তাকে তোমার মালিকানাধীন ওই সম্পদ চুরি করতে দাওনি, যার প্রতি সে আকৃষ্ট, উৎসুক এবং যাকে সে ভালোবাসে।

মহান আল্লাহর কসম! এটাই যুবকের মূল কথা।

আমি প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে নির্বোধ নই এবং এগুলোর বিরোধীও নই। আমি আমার লিখিত একটি বই (সুওয়ারুন ওয়া খাওয়াত্বির)-এ প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে এমন একটি পরিচ্ছেদ লিখেছি, আরবী ভাষায় প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে এ রকম কোনো পরিচ্ছেদ এখন পর্যন্ত লেখা হয়নি। *[উক্ত কিতাবে প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে শাইখ আলী তানতাবীর কথাগুলো এ রকম– 'কসম সেই খোদার, যিনি ফুলকে ফুলের ওপর ঝুঁকিয়ে দেন, যাতে কলি জন্মলাভ করে, যিনি কপোতকে কপোতীর ওপর সোহাগী করে তোলেন, যাতে ডিম সৃষ্টি হয়, যিনি পাহাড়কে পাহাড়ের নিকটবর্তী করে দেন, যাতে মধ্যখানে উপত্যকা তৈরি হয়, যিনি জমীনকে তার চলার পথে সূর্যের সামনে ভাঁজ করে দেন, যাতে পালাক্রমে দিন-রাত আগমন করে- তিনিই অন্তরের সাথে অন্তরের বাঁধন তৈরি করেন, যাতে সন্তান জন্মলাভ করে।*

যদি প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তা হলে গহিন বনে গাছ-বৃক্ষ-তরু-লতার শাখা অপর শাখার ওপর ঝুঁকে পড়ত না। অদূরের ঝুপড়িতে হরিণ হরিণীর ওপর সোহাগী হয়ে উঠত না। পাহাড় তার নিচের ছোট টিলার ওপর ঝুঁকে আসত না। ঝরনাও সাগরের দিকে তার নালা বইয়ে দিত না।

যদি প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তা হলে প্রচণ্ড খরতাপে জমীনের শুষ্কতা দেখে আসমান কেঁদে উঠত না। বসন্তের বাসন্তীরাঙা ফল-ফুল দেখে হেসেও উঠত না। আর জীবনও সুন্দর হতো না।

প্রেম-ভালোবাসায় কোনো অপরাধ নেই। প্রেমিকদের কোনো দোষও নেই। অপরাধী তো সে, যে প্রেমে পড়ে তার দ্বীনকে ভুলে যায়! অথবা তার পুরুষত্বকে নষ্ট করে দেয়! অথবা ক্ষণিকের স্বাদ আস্বাদন করতে গিয়ে হাজার বছরের শান্তিকে খরিদ করে নেয়। (সুওয়ারুন ওয়া খাওয়াত্বির, পৃষ্ঠা : ২০৯)-অনুবাদক] (এই গর্ব ও দাবির জন্য ক্ষমা চাই) তবে আমি মনে করি প্রকৃতার্থে ভালোবাসা আর কিছু নয়, শুধু শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গোপন আকাঙ্ক্ষার নাম। এটাই ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা। কবিরা ভালোবাসাকে যতই অলঙ্কৃত করুক না কেন এবং বলুক না কেন যে, প্লেটোর ভালোবাসার মতো কিছু ভালোবাসা আছে নিষ্কাম-পবিত্র। পবিত্র ভালোবাসার সমর্থক গোষ্ঠী যা কিছু বলুক না কেন, সবকিছু মিথ্যা। প্রত্যেক ভালোবাসার উদ্দেশ্য কিন্তু দেহই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এই উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা কখনো-বা খাটো হয়, আবার কখনো-বা দীর্ঘ।

যে তার প্রতিবেশীর মেয়েকে দেখে ভালোবেসে ফেলে, অতঃপর তাকে হালাল পথ ব্যতীত অন্য পথে কাছে পেতে চায়, তার উদাহরণ হলো ওই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো, যে মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি খাওয়ার কামনা করে, অথচ তার পকেটে কোনো টাকা নেই! সে মিষ্টির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর মিষ্টির প্রতি তার আসক্তিকে প্রকাশকরত গুণগুণ করে কবিতা গাইতে থাকে, অতঃপর যখন দোকানিকে মুফতে মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে আর দোকানি তার ডাকে সাড়া দেয় না এবং ইত্যবসরে একজন ক্রেতা এসে মূল্য পরিশোধ করে মিষ্টি খরিদ করে নেয়, তখন তার অবস্থা কবিকুলের শিরোমণি ইমরাউল কায়েসের মতো হয়ে যায়, যে কোথাও যাওয়ার সময় পথিমধ্যে নিজে থেমে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল এবং পথের অন্যান্য যাত্রীদেরও থামিয়ে কাঁদাতে লাগল! *[আরবের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবি 'ইমরাউল কায়েস' একবার তার দুজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ সে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া প্রেমিকার বাড়ির থেকে যাওয়া নিদর্শনাবলি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উভয় সাথিকেও দাঁড় করিয়ে অশ্রুসজল চোখে বিরহবিধুর কণ্ঠে কবিতা গেয়ে উঠেছিল :*

বন্ধুদ্বয়, দাঁড়াও! আমার প্রিয়া ও তার বাড়ির স্মরণে একটু কেঁদে নেই,

'দাখুল-হাওমাল' এর মধ্যে বাঁকা বালুর টিলার ওপর ছিল সেই বাড়ি।-অনুবাদক] সে ধারণা করল যে, নির্দয় ব্যবসায়ী তার অন্তরকে ভেঙে দিয়েছে। কেননা, সে তাকে তার কামনাকৃত মিষ্টি দেয়নি। তদুপরি ব্যবসায়ী তার ওপর মূল্য পরিশোধকারী ক্রেতাকে প্রাধান্য দিয়েছে বিধায় খরিদ করে নিয়েছে!

নিশ্চয় ক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে মিষ্টিকে খরিদ করেছে। এই মিষ্টির মধ্যে তোমার কী অধিকার আছে, হে মিষ্টিলোভী? তোমার কোন অধিকার আছে এই পিতার ওপর যে, তুমি তার কাছে তার মেয়েকে চাইবে শুধু মেয়ের সৌন্দর্যে

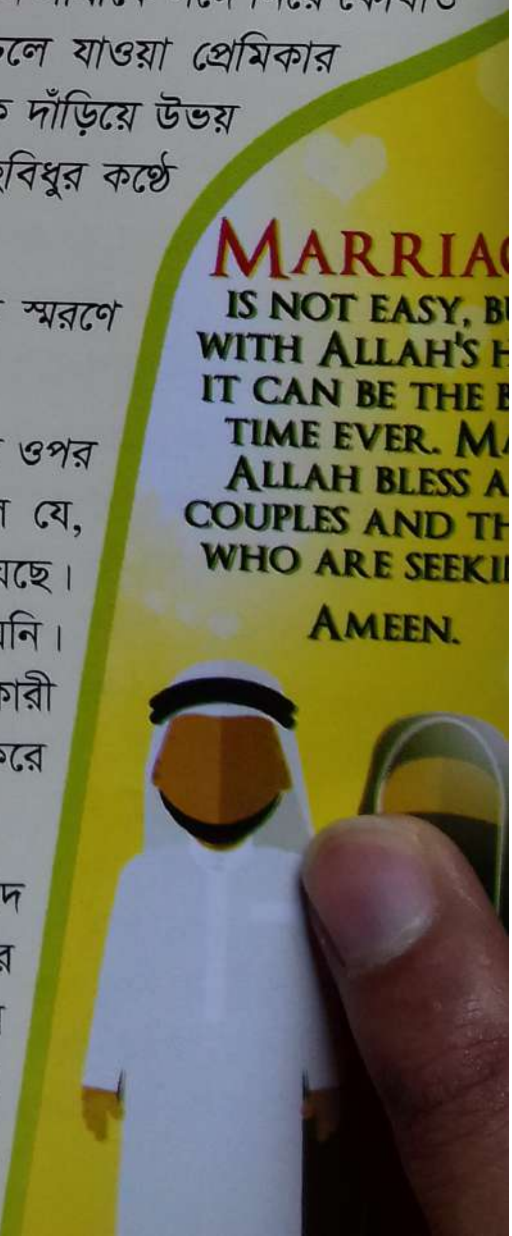

নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ বলে?

তুমি যখন মেয়ের সাথে তার পিতার অজান্তে সাক্ষাৎ করলে, তখন হারাম কাজ করলে।

যদি তুমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হতে, তা হলে হারাম ব্যতিরেকে হালাল পন্থা অনুসন্ধান করতে। অবশ্যই তুমি দিবালোকে আগমন করতে, রাতের অন্ধকারে নয়। অবশ্যই তুমি দরজায় প্রকাশ্যে নক করতে, জানালার নিচ দিয়ে বা গাছের ওপর দিয়ে আসতে না। তুমি মেয়ের বাপের কাছেই বিয়ের প্রস্তাব দিতে, মেয়ের কাছে নয়।

পিতা তার মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে বাধ্য নয়। যে পিতা তার মেয়েকে ওই ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় শুধু এই কারণে যে, ছেলে এসে বলে, 'আমি আপনার মেয়েকে ভালোবাসি'- ওই পিতা একজন পাগল।

আমি পাঁচ কন্যাসন্তানের জনক। তাদের দুজনকে আমি সবচেয়ে সহজ পন্থায় বিয়ে দিয়েছি। ওই ছেলের সাথে বিয়ে দিইনি, যাকে আমার মেয়ে ভালোবেসেছে বা তাকে ওই ছেলে ভালোবেসেছে। এ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। বরং আমি ওই ছেলের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি, যার দ্বীন, চরিত্র ও আর্থিক অবস্থার ওপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এ জন্য সে নিজে সুখী হয়েছে অন্যকেও সুখী করতে পেরেছে। সে নিজে সৌভাগ্যবতী হয়েছে। আমিও সৌভাগ্যবান হতে পেরেছি- আলহামদু লিল্লাহ।

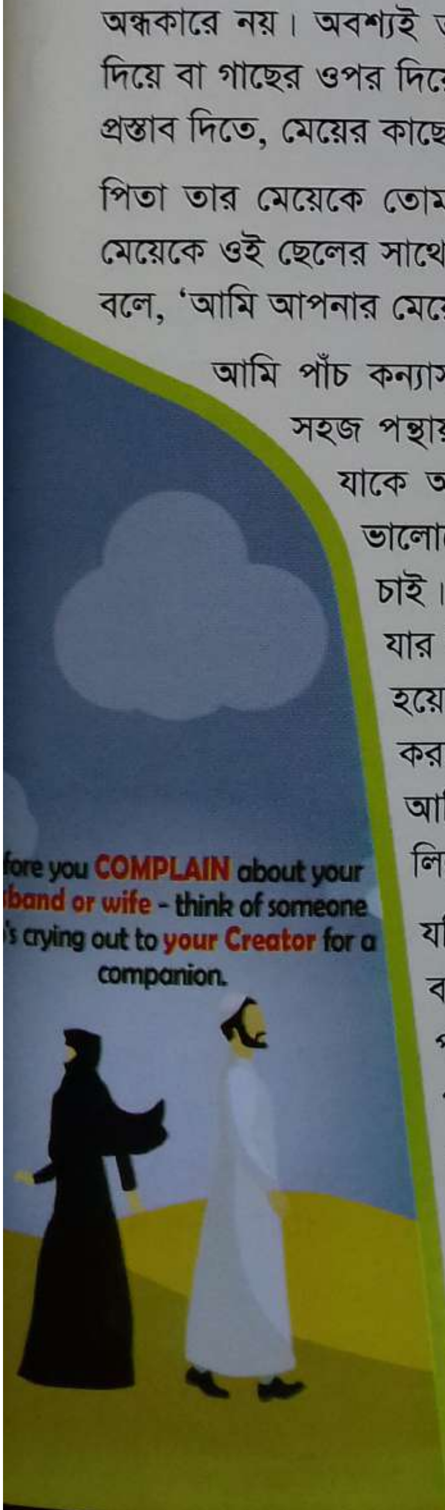

যদি তুমি ব্যবসায়ী হও আর তোমার কাছে কোনো ব্যক্তি এসে বলে, 'আমি আপনার দোকানের অমুক পণ্যটা চাই, আমার অন্তর সদা লটকে থাকে এই পণ্যটার সাথে, আমি সারারাত জেগে শুধু এই পণ্যটার কথা ভাবি', তা হলে কি তুমি তাকে এই পণ্যটা বিনামূল্যে দিয়ে দেবে?

তুমি বলতে পারো, 'মেয়ে কোনো পণ্য নয়, আর বিয়েও কোনো ব্যবসা নয়। ব্যবসায়িক

পণ্য হলো একটা জড়বস্তু, আর মেয়ে হলো রক্তে-মাংসে গড়া একটা মানুষ। যার একটি অন্তর আছে। অনুভূতি আছে। সে একটা ছেলেকে ঠিক তদ্রূপই ভালোবাসে, যদ্রূপ একটা ছেলে তাকে ভালোবাসে...

কিন্তু তুমি ভুলে যাবে যে, একটি মেয়ের এই বয়সেই ভালোবাসার জন্য অন্তর প্রস্ফুটিত হয়। যখন কোনো যুবক প্রথম তাকে প্রেম নিবেদন করে, তখন তার সেই অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। সে মনে করে যে, এ যুবকই তার হারানো সেই প্রেমিক!

অনেক সময় মেয়ে যে মাটি থেকে সৃষ্ট, যুবক সে মাটির ভিন্ন কোনো মাটি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। অনেক সময় যুবকের দৈহিক আকৃতি মেয়ের দৈহিক আকৃতি হতে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় যুবক একজন লুচ্চা-বদমাইশ হয়। তার উদ্দেশ্য থাকে একবার হলেও মেয়েকে কোনোরকম ভোগ করে আলগোছে কেটে পড়বে। কিন্তু তারপরও যদি মেয়ে ওই যুবককে বিয়ে করে, যুবকের প্রতি মেয়ের ভালোবাসা বিদ্বেষে রূপ নেবে। ওর সাথে তার পাতানো জীবন সংসার জাহান্নামের আকার লাভ করবে।

এ ধরনের যুবকের উদাহরণ ওই অতিমাত্রায় ক্ষুধাতুর ব্যক্তির মতো, যে খাওয়ার জন্য হোটেলে ঢুকে প্রথমেই 'মুজাদ্দারাহ' দেখতে পেল, আর তা থেকে কিছু খাওয়ার পর যখন তার ক্ষুধার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেল, তখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো 'কূযী'-র প্রতি, অতঃপর 'নামূরাহ'। এভাবে একের পর এক হোটেলে যত খাবার প্রদর্শিত আছে, সবগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই লাগল। কিন্তু প্রথমেই যে 'মুজাদ্দারাহ'র প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, এটাতে আর তার দৃষ্টি ফিরে যায় না! *[মুজাদ্দারাহ হলো মধ্যপ্রাচ্যের এমন একটি খাবার, যাকে ডাল-চাল ও পেঁয়াজের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। তদ্রূপ কূযী ও নামূরাহ এগুলো মধ্যপ্রাচ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবারবিশেষ।-অনুবাদ]*

আল-আইয়াম পত্রিকা একবার আমাকে বিয়ে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। বিয়ের ভিত্তি কী ভালোবাসার ওপর রাখতে হবে, নাকি যা কল্যাণকর তার ওপর? আমি উত্তরে বলেছিলাম, বিয়ের ভিত্তি যদি শুধু ভালোবাসার ওপর রাখা হয়, তা হলে সে বিয়ের উদাহরণ হলো পানির নালার ওপর লবণের খুঁটির ওপর নির্মিত অট্টালিকার মতো!

ভালোবাসা মদের ন্যায় আর প্রেমিক নেশাখোরের মতো। সে প্রেমিকার অসুন্দরকে সুন্দর আর ত্রুটিকে পূর্ণতা মনে করে। অতঃপর যখন তার আসক্তির নেশা কেটে যায় এবং তার মধ্যে পরিশুদ্ধ জ্ঞান ফিরে আসে, তখন প্রেমিকার সব ত্রুটির ব্যাপারে সচকিত হয়। প্রেমিকাকে তার প্রকৃত অবস্থায় দেখতে পায়, তখন অপছন্দ করে।

ভালোবাসার ওপর ভিত্তিকৃত বিয়ের ব্যাপারে আমার অগণিত ঘটনা জানা আছে। এ ব্যাপারে আমি পশ্চিমা সাহিত্যিকদের অসংখ্য কাহিনি পড়েছি। প্রত্যেকটি কাহিনি এটাই বর্ণনা করে যে, কীভাবে বিয়েপরবর্তী সহাবস্থান প্রেমিকের চোখের পর্দা উন্মোচন করে দেয়। সুতরাং মধুরাতের মাস পেরুতে না পেরুতেই ঝোলাগুড়ের বছর শুরু হয়ে যায়। অতঃপর কয়েক বছর কেটে যায় ঘোলাগুড়ের মধ্য দিয়ে। তৎপরবর্তী জীবনে আর কিছুই বাকি থাকে না, একমাত্র আলকাতরা ছাড়া এবং ত্বরিত মৃত্যুনিশ্চিতকারী বিষ ছাড়া।

শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ আগে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে, মজনু এর মতো প্রেমিক ইতিহাসে পাওয়া দায়। স্বয়ং মজনু-ও যদি লায়লাকে বিয়ে করত, তা হলে এক বছরের পর পর তাদের মধ্যে ঝগড়া দেখা দিত। দুই বছরের পর পর উভয়ে উভয়ের প্রতি অনীহা প্রকট আকার ধারণ করত। আর তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ির দাবি উঠত।

কখনো না! বিয়ের ভিত্তি কখনো শুধু ভালোবাসার ওপর রাখা যাবে না। হ্যাঁ, তা কেবল পাগল যুবকদের কাছে এবং উপন্যাস ও ফিল্মের মধ্যে রাখা যাবে।

পত্র লেখক হে যুবক! তোমার লম্বা-চওড়া চিঠিটা পড়ার পর মেয়ের বাপের বিপক্ষে অবস্থান করে তোমার পক্ষে অবস্থান করা আমার জন্য সম্ভব নয়।

তুমি মেয়ের পিতাকে অপরাধী আখ্যায়িত করেছ। কিন্তু আমি তোমার কাছে এই অনুমতি চাইব যে, আমি তোমাকে বলি, আসল অপরাধী তো তারা, যারা মানুষের মেয়েদের সাথে একাকী দেখা-সাক্ষাৎ করে মেয়েদের পিতাদের কাছে অনুমতি চাওয়া ব্যতিরেকে বা মেয়েদের মায়েদের এ ব্যাপারে অবহিত না করে। তুমি যদি সম্ভ্রান্ত হতে, তা হলে তুমি মেয়ের পিতার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে অথবা তোমার মায়ের কাছে চিঠি লিখতে, তিনি যেন ওই মেয়ের মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। এভাবেই সম্ভ্রান্ত

লোকেরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে, হে আমার সন্তান!

আর অপরাধী শুধু তুমি একা নও, মেয়ের পিতাও অপরাধী। তবে তিনি এ জন্য অপরাধী নন যে, তিনি তার সে মেয়েকে তোমায় দেননি, যে মেয়ের সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করেছ ও ভালোবেসে ফেলছ; বরং তিনি এ জন্য অপরাধী যে, তিনি তার মেয়ের দীক্ষা দেওয়াকে গুরুত্ব দেননি। তার পর্যবেক্ষণ করতে ত্রুটি করেছেন ও তার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছেন। তিনি তার মেয়েকে এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, তুমি তাকে ভালোবাসতে পেরেছ ও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছ। *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. অন্যত্র বলেন, 'মেয়েদের পিতারাই সব সমস্যার মূল। তারা মেয়েদের এমনভাবে ঢিল দেয় যে, তারা নিজেরাই 'হালাল' ব্যতীত আর কোনো রাস্তা চেনে না! প্রায় সব মুসলিম দেশেই মেয়েদের পিতারা তাদের মেয়েদের খোলামেলাভাবে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ করে ঘরের বাইরে বের হতে দেয়। তাদের শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু যখন কোনো সন্তোষজনক চরিত্রবান, দ্বীনদার ও আমানতের অধিকারী পাত্র বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, সে তাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহারের সম্মুখীন হয়, যেই ব্যবহারের সম্মুখীন হয় একজন ফিলিস্তিনী বন্দী ইসরায়েলের কারাগারে!' (ইরহামুশ-শাবাব, পৃষ্ঠা : ১৫)-অনুবাদক]*

এ ধরনের পিতার উদাহরণ ওই মিষ্টি বিক্রেতার মতো, যে খোলামেলা গলিতে মিষ্টি রেখে চলে যায়। অতঃপর যখন একদল শিশু এসে মিষ্টিগুলোকে হাতে উঠিয়ে নিল বা কুকুরের দল এসে ঝাপটে নিয়ে খেয়ে ফেলল, তখন মিষ্টি বিক্রেতা কোত্থেকে দৌড়ে এসে চিল্লাচিল্লি শুরু করল এবং মানুষ ও তার ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগল!

ওই পিতা যদি বুদ্ধিমান হতেন, তা হলে জানতেন যে, তার ও তোমার পিতার অজান্তে তার মেয়ের সাথে তোমার গোপন সাক্ষাৎ বারুদের সাথে আগুনের সংস্পর্শের মতো। সুতরাং যে মনে করবে যে, বারুদ আর আগুন পরস্পর মিলিত

হওয়ার পরও বিস্ফোরণ হবে না, তার ঠিকানা হলো পাগলাগারদ।

এখান থেকেই সব বিপদ আমদানি হয়েছে, হে পিতৃকুল! আপনাদের ছেলে-মেয়েদের দ্বীন ও চরিত্রের ওপর দীক্ষাদানে আপনাদের গুরুত্বহীনতার কারণেই এসব বিপদ নেমে এসেছে। যদি আপনারা ক্লাবে ও কফিখানায় আড্ডা দেওয়া ব্যতিরেকে নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির সাথে প্রতিটি রাত যাপন করতেন এবং তাদের সীরাত, হাদীস ও তাফসীর থেকে কিছুটা শিক্ষা দিতেন এবং তাদের আল্লাহর ভয়ের শিক্ষা দান করতেন; তদ্রূপ তাদের উপযোগী, চরিত্রগঠনকারী বিদ্যালয়ে পড়তে দিতেন ও তাদের শালীন, আব্রুর পোশাক পরাতেন এবং তাদের ঘরে-বাইরে পর্যবেক্ষণ করতেন, তা হলে মোটেও কোনো যুবক একজন মেয়ে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না এবং একজন মেয়ে কোনো যুবক দ্বারা প্রবঞ্চনার শিকার হতো না। আবার সমাজে এসব অনিষ্টতা দেখা দিত না।

অতঃপর আপনারা সতর্ক হোন ওই সব উপন্যাস আর ফিল্মের ব্যাপারে। কেননা, অনেক উপন্যাসে বিষ বিদ্যমান। তদ্রূপ অনেক ফিল্মেও বিষ বিদ্যমান। অনেক বন্ধু ও বান্ধবীর সাহচর্যও বিষমিশ্রিত। যখন আপনারা আপনাদের ছেলে-মেয়েদের বেলায় ওই বিষকে ভয় করেন, যা দেহ হত্যা করে ফেলে, তা হলে কেন তাদের মুক্ত ছেড়ে দেন যে, তারা এমন বিষ পান করবে, যা তাদের দ্বীন ও চরিত্রকে হত্যা করে ছাড়ে?!

সুতরাং সতর্ক হন, হে পিতৃকুল! বরং মায়েরা যেন প্রথমে সতর্ক হয়। কারণ, মেয়ের সংশোধনী মায়ের থেকেই হয়। তদ্রূপ মেয়ের নষ্টামো মায়ের থেকে। একজন মা-ই হলেন তার মেয়ের আদর্শ পোশাক ও তার চাল-চলনের ক্ষেত্রে। মা-ই হলেন মেয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও পর্যবেক্ষক।

সুতরাং হে মাতৃকুল! আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ ও মানুষের সামনে। সুতরাং তুমি প্যারিস ও রোমা'র ফ্যাশন কামনা কোরো

না; বরং দ্বীন ও চরিত্রের ফ্যাশন কামনা করো।

মেয়েদের বিয়ের বাজার মন্দা হওয়ার একমাত্র কারণ এই অনিষ্টতা। একমাত্র শালীন, চরিত্রবতী মেয়েদেরই বিয়ে করা হয়, নষ্টা মেয়েদের কেউ বিয়ে করে না। এমনকি নষ্ট যুবকও যদি বিয়ে করতে চায়, তা হলে সে সম্ভ্রান্ত, শালীন ও পর্দানশীন মেয়ে ছাড়া বিয়ে করতে চায় না। এটাই সমাজের চাক্ষুষ অবস্থা।

সুতরাং হে মাতৃকুল! আপনারা আপনাদের মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না। আপনারা কখনো এ কথা মনে করবেন না যে, আমরা ফিরিঙ্গিদের মতো হয়ে যাব। কেননা, একজন আরব ব্যক্তি কখনো তার সম্মানের বেলায় হীনম্মন্য হয়না। স্বয়ং পশ্চিমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 'রুশ ব্যক্তির চামড়া চুলকিয়ে দেখো, তাতারি ব্যক্তির চামড়া বেরিয়ে আসবে।' সেই হিসাবে আমিও বলি, 'ফিরিঙ্গিদের অনুসরণকারী আরব ব্যক্তির চামড়া এমনভাবে চুলকিয়ে দেখো, যাতে ওপরের আবরণ সরে যায়- মূল আরব চামড়াই প্রকাশ পাবে।'

ছোটবেলায় আমাদের একজন বন্ধু ছিল, যে পশ্চিমা নতুন চিন্তাধারায় নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করত। সে বার বার এই কথাটাই বলত, যা মানবতা বিবর্জিত ইউরোপিয়ানরা বলে থাকে যে, নারী তার দেহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা ইচ্ছা তা করতে পারে, সতীত্বের কোনো মূল্য নেই- এ রকম আরও অনেক বেমানান কথা। পরবর্তী সময় আমরা তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম। তার একজন যুবতী বোন ছিল। আমরা সকলে মিলে তার বোন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করলাম। তার বোনের ব্যাপারে মানহানিকর কথা বলতে আরম্ভ করলাম। আমরা তাকে বোঝাতে চাইলাম যে, আমাদের একজনের সাথে তার বোনের সম্পর্ক আছে। তার বোন সম্পর্কে এমন কথা শুনতেই তার চোখ দুটো এমনভাবে পাকিয়ে নিল যে, তা সামনের দিকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়ে পড়ল! তার চেহারা লাল হয়ে গেল! গলার রগগুলো ফুলে উঠল! সে নারীস্বাধীনতা নিয়ে যেসব প্রলাপ বকত, সব ভুলে বসল। আমরা যার দিকে তার বোনের সম্পর্কের সম্বন্ধ করেছিলাম, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ঘাড় চেপে ধরল। যদি না আমরা তাকে বাঁচাতাম, তা হলে সে আমাদের ওই সাথির ইহলীলা সাঙ্গ করেই তবে ক্ষান্ত হতো!

এটাই আমাদের চরিত্র, হে চিঠি প্রেরণকারী যুবক! আমরা ভালোবাসা নিয়ে

খেল-তামাশা করি, ভালোবাসার রোমাঞ্চকর কাহিনি ও প্রণয়কাব্য পড়ি, এটাকে অনেক সুন্দর মোড়কে অবলোকন করি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমাদের থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যখন এটা আমাদের ঘরে ঢুকে যায়, আমাদের মেয়ে বা বোনদের পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়, তখন আর এটা এমন কোনো বিষয় থাকে না, যা আমরা উপভোগ করি বা এমন কোনো কাব্য থাকে না, যাকে বার বার আওড়িয়ে আমরা প্রফুল্ল হই; বরং তখন তা মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়! আর আরবদের মর্যাদা যখন কলুষিত হয়ে যায়, তখন এটাকে রক্ত ব্যতীত আর কিছু ধৌত করতে পারে না।

আর একজন আরব ব্যক্তি আত্মাহুতি দিয়ে ফেলে বা জীবনবাজি রেখে ফেলে, শুধু তার সম্মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে। তুমি কি একজন আরব পিতার পক্ষ থেকে এতটুকু সুযোগ পাবে যে, তুমি তার মেয়েকে ভালোবাসার প্রবঞ্চনায় ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে একান্ত সময় কাটাবে আর তিনি এসে তোমার ললাটে চুমো এঁকে দেবেন এবং তার মেয়েকে চকলেটের মতো পলিথিনের মোড়কে মুড়িয়ে তোমায় দিয়ে দেবেন?

আমি আশা রাখি যে, তুমিও একদিন পিতা হবে এবং অবশ্যই দেখতে পাবে, একজন আরব পিতা যা করে থাকেন তার মেয়ের সাথে সম্পর্কস্থাপনকারী ও তার অজান্তে তার মেয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎকারী ছেলের সাথে। ওই দিনই তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করবে যে, তুমি এ রকম একটি সংকটময় পরিস্থিতি থেকে ধড়ের মধ্যে মাথাটা নিয়ে প্রাণসহ বেরিয়ে আসতে পেরেছ বলে। ওই দিনই তুমি পরিচয় করতে পারবে যে, ভালোবাসা যখন মর্যাদা-সম্মানের মুখোমুখি হয়ে যায়, তখন এটা আর কিছুই থাকে না; বরং সূর্যের কিরণ লেগে ঝিকিমিকি করা বরফনির্মিত একটা নয়নাভিরাম মূর্তিমাত্র!

[সূত্র : ফুসূলুন ইজতিমাঈয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ২৩৯]

ভালোবাসার বিয়ে

আল-আইয়াম পত্রিকার একটি প্রশ্নের জবাব
(১৯৫৯ সালে প্রকাশিত)

আমার কাছে প্রতিদিন আল-আইয়াম পত্রিকা নতুন নতুন ফতোয়া ও প্রশ্ন নিয়ে আগমন করে। এগুলো পড়ার দ্বারা জমাটবদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি নড়ে ওঠে। নির্বাপিত অনুভূতি দপ করে জ্বলে ওঠে। এগুলো লেখকদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ও কলম সঞ্চালনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং পাঠকরা উপভোগ করেন লেখকদের মস্তিষ্ক উদ্‌গত জ্ঞান আর তাদের কলমের কাটা ফসল।

আল-আইয়াম পত্রিকা আমাদের কাছে সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আগমন করেছে, তা হলো বিয়ে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন, শুধু ভালোবাসার ওপর কি বিয়ের ভিত্তি রাখা যাবে? এবং বিয়ের বয়স সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন, পুরুষের জন্য কোন বয়সে বিয়ে করা সংগত?

এ প্রশ্নের বিভিন্নজন বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু জবাব ছিল আশ্চর্জনক! আমি কারও সাথে তর্ক বা কারও কথার খণ্ডন করতে চাই না। কেবল আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি, তা প্রকাশ করতে চাই। সুতরাং যে আমার ওপর ভরসা রাখবে ও আমার দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করবে, তা-ই যথেষ্ট ও কতই-না উত্তম! আর যে আমার বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করবে, আমি তার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। আমি তার অভিভাবকও নই।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে পদার্পণের আগে আমি বোঝাতে চাই যে, ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়-যার ব্যাপারে আপনারা প্রশ্ন করছেন?

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাব সৃষ্টি করেছেন। একটি নিজ সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। অপরটি বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য।

অপরটি বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য। প্রথম স্বভাবের দ্বারা ক্ষুধাবোধ তাকে খাবারের অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে, যাতে মরণের হাত থেকে সে বাঁচতে পারে। দ্বিতীয় স্বভাবের দ্বারা জৈবিক চাহিদা তাকে নারীর সান্নিধ্যে গমনের জন্য উত্তেজিত করে তোলে, যাতে সন্তান লাভ করার দ্বারা তার বংশধারা অটুট থাকে।

কখনো খাবার হোটেলের মধ্যে আপনার সামনেই উপস্থিত থাকে। খাবারের পয়সাও আপনার পকেটেই থাকে। আপনি খাবারের ব্যাপারে একটু চিন্তা করতেই সামনে খাবার দেখতে পান। আবার কখনো চাহিদার অপর বস্তুটা (নারী) আপনার আয়ত্তে থাকে। আপনার জন্য সম্পূর্ণ হালালও হবে। আপনার ডাকে সাড়া দেবে। সুতরাং তার কল্পনায় আপনার মস্তিষ্ক ভরপুর থাকবে না। তার অপেক্ষায় আপনার ইন্দ্রিয়াবলি হয়রান হবে না।

কখনো এমন হয় যে, ক্ষুধা বিদ্যমান কিন্তু খাবার অনুপস্থিত। আপনি যতই ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করবেন, ততই খাবারের স্বাদ আপনার কল্পজগতে বাড়তে থাকবে। আর সময় যত দীর্ঘায়িত হতে থাকবে, খাবারের চিন্তা মস্তিষ্কে ততই মজবুত হতে থাকবে। (এটাই মনোবিজ্ঞানীদের কথা)। সুতরাং আপনি শুধু এটাই চিন্তা করবেন। আপনার মন শুধু এটার দিকেই ধাবিত হবে।

তেমনই একজন মানুষের যৌনক্ষুধা থাকে, কিন্তু চাহিদা চরিতার্থ করার বস্তুটা বিদ্যমান হয় না। এ ক্ষেত্রেও আপনার চিন্তা খাবারের চিন্তার মতোই একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে। আমরা এটাকেই 'ভালোবাসা' বলে থাকি। এই চিন্তা খাবারের চিন্তা থেকে আরও বেশি প্রকট। কেননা, এটার অন্বেষণকারী ব্যক্তি যখন এটার চিন্তা করে, তখন এই

বস্তুর রং ও সত্তার মধ্যে চিন্তা করে না। যৌনক্ষুধিত ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় নির্দিষ্ট নারীকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। সারা দুনিয়া এই একজন নারীর মধ্যেই এসে সীমিত হয়ে যায়! [হাফিয আল্লামা মুরতাযা যাবীদি রহ. তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ তা-জুল আরূস এর মধ্যে উল্লেখ করেন যে, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানি রহ. তার খাওলান সম্প্রদায়ের যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে খাওলান সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের মহিলা ও স্বামীহীনা নারীদের বিয়ে করো। কেননা, তীব্র কামলালসা একটি মারাত্মক বিষয়। সুতরাং তোমরা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর জেনে রাখো যে, কামাতুর ব্যক্তির কোনো বিবেক-বিবেচনা থাকে না।

ইমাম সাঈদ ইবনে মানসুর রহ. তার সুনানের মধ্যে কথাটাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, আর জেনে রেখো যে, কামাসক্ত ব্যক্তির কোনো কর্ণ নেই। (তা-জুল আরূস শারহুল ক্বামূস : ৫/২৬৫ ও সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর : ৩/১-১২৩)-অনুবাদক]

সে সব সময় খুঁজতে থাকে কীভাবে সে-ই নারীকে একপলক দেখা যায়, কীভাবে তার সাথে দুটি কথা বলা যায়! আপনারা কী মনে করেন, একটি দর্শনেই তার যথেষ্ট হয়ে যাবে? দুটি কথা বলার দ্বারা কি সে তুষ্ট হয়ে যাবে? এই চাহিদাও ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো। ক্ষুধার্তের জন্য কি খাবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, ঘ্রাণ শোঁকা ও খাবারের গুণে ছন্দময় কবিতা গাওয়া কি যথেষ্ট হয়ে যায়?

হে আমার সন্তানেরা, আল্লাহর কসম! কস্মিনকালেও না। সে কেবল চোখ দিয়ে তার রূপ-সৌন্দর্য, কান দিয়ে কথার মাধুর্য কামনা করে না; বরং তালার জন্য চাবির অন্বেষণ করে। এটা মানুষের মজ্জাগত চাহিদা। এই চাহিদা কখনো দৈহিক মিলন ছাড়া পূর্ণ হয় না। [হযরত আমির ইবনে রাবী'আহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে, তখন তৃতীয়জন থাকে শয়তান।' (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৪৬; নাসবুর রা-য়াহ : ৪/২৫০)-অনুবাদক]

ভালোবাসাকে কবি-সাহিত্যিকরা যতই সুন্দর উপমা আর কমনীয় বর্ণনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলুক না কেন, এটি জৈবিক চাহিদা আর দৈহিক মিলনের একটি আকাঙ্ক্ষা। নিষ্কাম-পবিত্র ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই। এটি একটি অনর্থক প্রলাপ। এটি পাগল ও যুবকদের কথা।

এটাই বাস্তবতা। কেউ অস্বীকার করলে তার নিজের মনের মধ্যে এর বিরোধিতা অনুভব করবে। প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রমাণিত যে, এটাই বাস্তবতা। এটা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। তাই শুধু ভালোবাসা-ই কি বিয়ের ভিত্তি হতে পারে?

ভালোবাসা হলো দৈহিক ক্ষুধা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কি খাবারের ভাল-মন্দ যাচাই করতে পারে? তার ক্ষুধা তো 'মুজাদ্দারাহ' কেও জিহ্বার মধ্যে তার জন্য এমনভাবে সুস্বাদু করে তোলে যে, সে 'মুজাদ্দারাহ' কে ভুনা মেষ মনে করে! অতঃপর যখন ক্ষুধার তীব্রতা দূর হয়ে যায়, সে 'মুজাদ্দারাহ' কে 'মুজাদ্দারাহ'-ই মনে করে। তার কাছে ধরা পড়ে যে, এ তো ভুনা মেষ ছিল না; বরং ক্ষুধার তীব্র লালসা।

ঠিক একজন প্রেমিকের বিষয়টাও এমনই। ভালোবাসার তীব্রতার কারণে সে কল্পজগতে প্রেমিকাকে এমন নয়নাভিরাম কাপড় পরায়, যে কাপড়ে তাকে সে সবচেয়ে সুন্দরী মনে করে। যখন সে তাকে ওই কাপড়ে বিয়ে করে, কল্পজগতে যে কাপড়ের সৌন্দর্যে ধাঁধায় পড়েছিল সে, অতঃপর যখন ভালোবাসা চলে যায়, সাথে কাপড়ের সৌন্দর্যও চলে যায়। তাদের মধ্যে আর বিয়ের বন্ধন বাকি থাকে না। কারণ, এই মেয়েকে তো আর সে বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছিল সে তার পরনের কাপড়কে। ভালোবাসাও আর প্রকৃতার্থে দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষায় হয়ে থাকে না। সুতরাং ভালোবাসার চলে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী যখন এই যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষাটা চলে যাবে। তদ্রূপ মজনুর জ্ঞান ফিরে পাওয়াটাও অবশ্যম্ভাবী। আর যখন মজনু জ্ঞান ফিরে পাবে, তখন লাইলী তার কাছে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী না থেকে সাধারণ একজন মেয়ে বলে সাব্যস্ত হবে। লাইলীর মধ্যে আর তার কোনো আসক্তি থাকবে না। যেমনিভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধাবোধ চলে যায় তার উদরপূর্তি হয়ে গেলে। ভালোবাসা একটি সাময়িক অপেক্ষার প্রহর, প্রথম স্পর্শেই যার অবসান ঘটে। আপনারা কি স্পর্শের অর্থ জানেন? বিয়ে একটি স্থায়ী সম্পর্ক। সর্বদা অপেক্ষার প্রহরের মুখাপেক্ষী হয়। আর তা স্পর্শের মাধ্যমে শক্তিশালী ও

মজবুত হয়। কালের আবর্তে শুধু গাঢ় হতেই থাকে।

আমি বিভিন্ন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং শিষ্টাচার নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনাকারীদের একজন। ভালোবাসার ওপর ভিত্তি রাখা বিয়ে নিয়ে আমি অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাস পড়েছি। প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের শেষ পরিণতি হলো বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পর্কের বিভাজন। ওয়ারদারের বেদনা, পুল, ফার্জিলিন এবং জুসির মতো প্রেম-বেদনায় হতাশ লোকদের পাতা ফাঁদে পড়বেন না। কথায় প্রতারিতও হবেন না। কারণ, তাদের জীবনে ঘটে যাওয়ার মূলে ছিল প্রবৃত্তির এসব প্রেম-বিলাসিতা, জৈবিক চাহিদা- যা নিয়ে এইমাত্র আলোচনা করলাম। তাদের প্রত্যেকেই যদি বৈবাহিক ভালোবাসার ভিত্তিতে বিয়ে করত, তা হলে আমার মতোই কথা বলত।

বিয়ের ভিত্তি শুধু ভালোবাসার ওপর রাখা ঠিক নয়। হ্যাঁ, তখনই ঠিক হবে, যখন একটি বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি পানির নালার ওপর রাখা ঠিক হবে।

বিয়ের ভিত্তি হতে হবে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এরপর আসবে ভালোবাসার বিষয়টি। বিয়ের ইচ্ছুক ছেলে মেয়েকে দেখবে, মেয়ে ছেলেকে দেখবে। অর্থাৎ, অভিভাবক বা কোনো মাহরাম ব্যক্তির উপস্থিতিতে ছেলে শুধু মেয়ের চেহারা ও হাত কবজি পর্যন্ত দেখতে পারবে। এখন যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ঢেলে দেন, তা হলে বিয়ের সাথে এটা একটা স্থায়ী ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে।

আর যদি অনীহা ঢেলে দেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের একে অপরের থেকে মুক্ত করে দেবেন। এটাই আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব।

(সূত্র : মা'আন নাস, পৃষ্ঠা : ৫২)

বিয়ের উপযুক্ত বয়স
(১৯৫৯ সালে প্রকাশিত)

অপর প্রশ্নটির জবাব হলো, বিয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি যখন প্রথম একদিন এ ব্যাপারে পূর্ণ অনুভূতিশক্তি লাভ করবে, সেটাই তার বিয়ের উপযুক্ত বয়স। বয়স নির্ধারণের জন্য কোন দলিল-প্রমাণ অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। কারও মতে বিয়ের বয়স হচ্ছে ত্রিশ। কারও মতে চল্লিশ। কিন্তু জবাব প্রদানের ক্ষেত্রে যদি এটা অপরিহার্য হয়ে থাকে যে, জবাবটা সমীচীন হতে হবে সেই প্রকৃতির, যেই প্রকৃতির ওপর মজ্জাগতভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই স্বভাবের, যেই স্বভাবের ওপর আল্লাহ তা'আলা জগতের সব বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে জবাবটি বোঝার জন্য একটি ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর তা হলো এই যে, আমি আগেও আপনাদের বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুটি সহজাত স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো স্বয়ং নিজেকে বাঁচানোর স্বভাব। যে স্বভাব খাওয়ার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে। দ্বিতীয়টি হলো বংশধারা ঠিক রাখার স্বভাব। যে স্বভাবের কারণেই মানুষের বংশধারা ঠিক থাকে। এই দুটির প্রথমটির বেলায় যা প্রযোজ্য, দ্বিতী-য়টির বেলায়ও তা প্রযোজ্য। আচ্ছা বলুন তো, মানুষ কখন খাবার খায়? তা হলে আমিও আপনাদের বলে দেবো মানুষ কখন বিয়ে করে।

মানুষ কখন খাবার খায়?

জবাবে আপনারা বলবেন, যখন ক্ষুধা লাগে। তো আমিও বলব, একটি ছেলে তখনই বিয়ে করবে, যখন তার কামলালসা জাগ্রত হবে। অর্থাৎ যে সময়ে সে পৌরুষের বয়সে পৌঁছে যাবে। মানে আঠারো বছরে পদার্পণ করবে। *[যুবসমাজের চারিত্রিক স্খলন আর নৈতিক অবক্ষয় ঠেকানোর একমাত্র মহৌষধ 'বিয়ে'র ব্যাপারে ওসমানী*

খিলাফাহর শরী'আহ ও বিবেকসম্মত কতগুলো চমৎকার আইন। আইনগুলো ১৯২২ সাল পর্যন্ত ওসমানী খিলাফাহর কানুননামার এক অংশবিশেষ। বর্তমান সময়ে এই আইনগুলো বলবৎ থাকলে আমাদের সমাজে কি অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, পরকীয়া, নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং ইত্যাদি নৈতিক রোগ-বালাই জন্ম নিত? যুবতীরা কি আইবুড়োত্বের অভিশাপ নিয়ে মানবেতর জীবনাতিপাত করত? বিয়ের বাজারে মন্দা দেখা দিত? পতিতাবৃত্তি রমরমা হয়ে উঠত?

এক. ঐচ্ছিক বিয়ের বয়স শুরু হতো আঠারো থেকে। শেষ হতো পঁচিশে। এর মধ্যে বিয়ে না করলে, তাকে বাধ্য করে বিয়ে করানো হতো।

দুই. যদি কেউ অসুস্থতার অজুহাত দেখাত, তদন্ত করে দেখা হতো, বক্তব্যটা সঠিক কি না। রোগটা নিরাময়যোগ্য হলে, সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় চাপ স্থগিত রাখা হতো। আর দুরারোগ্য ব্যাধি হলে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হতো।

তিন. পঁচিশ হয়ে যাওয়ার পরও যদি কেউ বিনা কারণে বিয়ে না করে থাকত, তার আয়, ব্যবসা বা সম্পদের, এক-চতুর্থাংশ কেটে রাখা হতো। জব্দকৃত অর্থ নিয়ে বিবাহ-ইচ্ছুক গরিবদের বিয়ের বন্দোবস্ত করা হতো।

চার. পঁচিশের পরও বিয়ে না করলে, তাকে রাষ্ট্রীয় কোনো চাকরিতে নেওয়া হতো না। কোনো সংগঠনেও ভুক্তি দেওয়া হতো না। আর চাকরিতে থাকলে, ইস্তফা দেওয়া হতো।

পাঁচ. আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে যদি কোনো গরিব যুবা বিয়ে করত, তাকে হুকুমতের পক্ষ থেকে ১৫৯ থেকে শুরু করে ৩০০ দুনমা পরিমাণের জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। চেষ্টা করা হতো জমিটা যেন তার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও হয়। এক দুনমা সমান : ৯০০ মিটার।

ছয়. গরিব বর যদি কারিগর বা ব্যবসায়ী হয়, তাকে পুঁজিপাট্টা দেওয়া হতো। কোনো বিনিময় ছাড়াই। তিন বছর মেয়াদে।

সাত. ছেলে বিয়ে করার পর, বাবা-মায়ের সেবা করার জন্য আর কোনো ভাই না থাকলে, বরকে বাধ্যতামূলক সেনা কার্যক্রম থেকে রেহাই দেওয়া হতো। তদ্রূপ মেয়ের বিয়ের পর যদি বাবা-মায়ের সেবার জন্য ঘরে কেউ না থাকে, মেয়ের জামাইকেও বাধ্যতামূলক সেনা কার্যক্রম থেকে রেহাই দেওয়া হতো।

আট. পঁচিশের আগেই বিয়ে করে তিন সন্তানের বাবা হলে, নৈশস্কুলে বিনামূল্যে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। সন্তান তিনজনের বেশি হলে, তিনজনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হতো। বাকি সন্তানদের জন্য দশ টাকা করে বরাদ্দ করা হতো, তেরো বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত।

কোনো মহিলার ঘরে চার বা তার চেয়ে বেশি ছেলেসন্তান থাকত, তাকে মাথাপিছু ২০ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হতো।

নয়. কোনো ছাত্র লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকলে, লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত রাখার অনুমতি দেওয়া হতো।

দশ. কোনো কারণে স্বামীকে অন্য এলাকায় থাকতে হলে, বাধ্য করা হতো সাথে করে স্ত্রীকেও নিয়ে যেতে! যুক্তিসংগত কোনো কারণে স্ত্রীকে সাথে নিতে না পারলে, স্বামীর যদি আরেক বিয়ে করার সামর্থ্য থাকত, তাকে কর্মস্থলে আরেক বিয়ে করতে বাধ্য করা হতো। তারপর চাকরি শেষে নিজের এলাকায় ফিরলে, দুই স্ত্রীকেই সমান অধিকারে রাখতে বাধ্য করা হতো।-অনুবাদক]

আপনারা প্রশ্ন করবেন, এ বয়সে পৌঁছার পরও যদি বিয়ে করার সব সরঞ্জামাদি প্রস্তুত না থাকে, তা হলে কী করবে? আমি বলব, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পয়সা না থাকলে সে যা করে, এই যুবকও তা করবে। খাবার হাতে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে।

আপনারা বলবেন, যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে না পেরে অন্যের খাবার উপস্থিত পেয়ে চুরি করে খেয়ে ফেলে এবং অপরাধী বনে যায়, তা হলে আমরা কী করব?

এ ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হলো, প্রতিটি সমাজে অনাহারীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হোক, যেন তারা চুরি বা কোনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে। যদি কোনো কারণে সমাজের লোক তাদের থেকে চুরির আশঙ্কা করে, তা হলে সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, যার যার অর্থসম্পদ ও মাল হেফাযত করা। এখন তাদের চুরি করা একদিকে বৈধ। কারণ, সমাজ তাদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এটা জৈবিক অধিকার। অপরদিকে অবৈধ। কারণ, তারা অন্যের সংরক্ষিত জিনিসে হাত লাগিয়েছে।

ঠিক একই কথা বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মূলত একজন ছেলের বিয়ের স্বাভাবিক বয়স হলো, যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। [কুরআন-হাদীসে সন্তানদের যথাসম্ভব ত্বরিত বিয়ে করিয়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রদান করা হয়েছে–

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্বামীহীনা মেয়ে ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিয়ে করিয়ে দাও। যদি তারা দরিদ্র হয়, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সচ্ছলতা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী।'(সূরা নূর (২৪) : ৩২)

ইমাম কুরতুবী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহর তা'আলার এই সম্বোধন ইজ্জত-আব্রু ও সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও তাদের, যাদের কোনো স্বামী নেই। কেননা, বিবাহ ইজ্জত-আব্রুকে ঠিক রাখার মাধ্যম। আর এখানে সম্বোধনটা অভিভাবকদের জন্য।'

(তাফসীরে কুরতুবী : ১২/২৩৬)

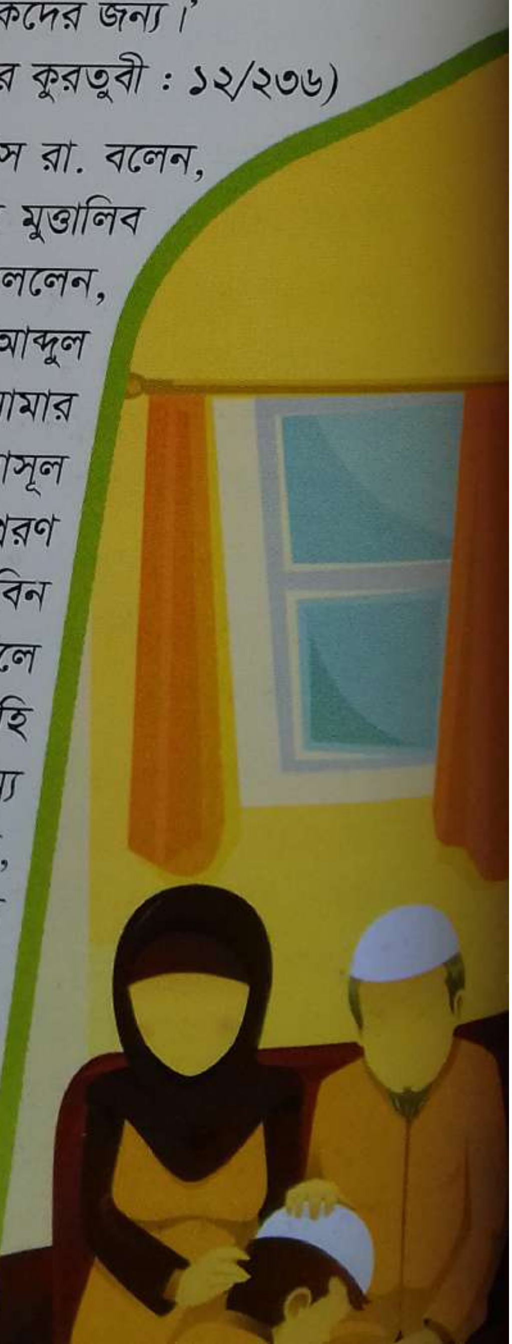

হযরত আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবী'আহ বিন হারিস রা. বলেন, 'রাবী'আহ বিন হারিস ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. একবার একত্র হলেন। তাঁরা একে অপরকে বললেন, কসম আল্লাহর! আমরা যদি এই দুই ছেলেকে (আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবী'আহ বিন হারিস বলেন, তাঁরা আমার ও ফজল ইবনে আব্বাসের কথা বলেছেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রেরণ করতাম। উক্ত হাদীসের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবী'আহ বিন হারিস বলেন, আমরা বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজল ইবনে আব্বাস রা. এর জন্য মাহমিয়্যাহ নামক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, এই ছেলের সাথে তুমি তোমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দাও। সুতরাং মাহমিয়্যাহ ফজল ইবনে আব্বাসের সাথে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন। এবং আমার জন্য নওফল বিন হারিসকে সম্বোধন করে বললেন, এই ছেলের সাথে তুমি তোমার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দাও। সুতরাং নওফল বিন

হারিস তাঁর কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

(সহীহ মুসলিম, যাকাত অধ্যায়)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবী'আহ বিন হারিস রা. এর কথা, 'আমরা বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে গিয়েছিলাম।'

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আদেশ করলেন যে, তুমি উসামা বিন যায়েদ রা. কে বিয়ে করে নাও, কিন্তু তিনি উসামাকে অপছন্দ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করে নাও, এবার তিনি তাঁকে বিয়ে করে নিলেন। পরে আল্লাহ তাঁদের দাম্পত্যজীবনে অনেক কল্যাণ দান করেছিলেন এবং ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. উসামা বিন যায়েদ রা. কে নিয়ে অনেক গর্ব করেছিলেন। আর যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামার সাথে ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. এর বিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন উসামা রা. এর বয়স ষোলো এর চেয়েও কম ছিল! (সহীহ মুসলিম)-অনুবাদক]

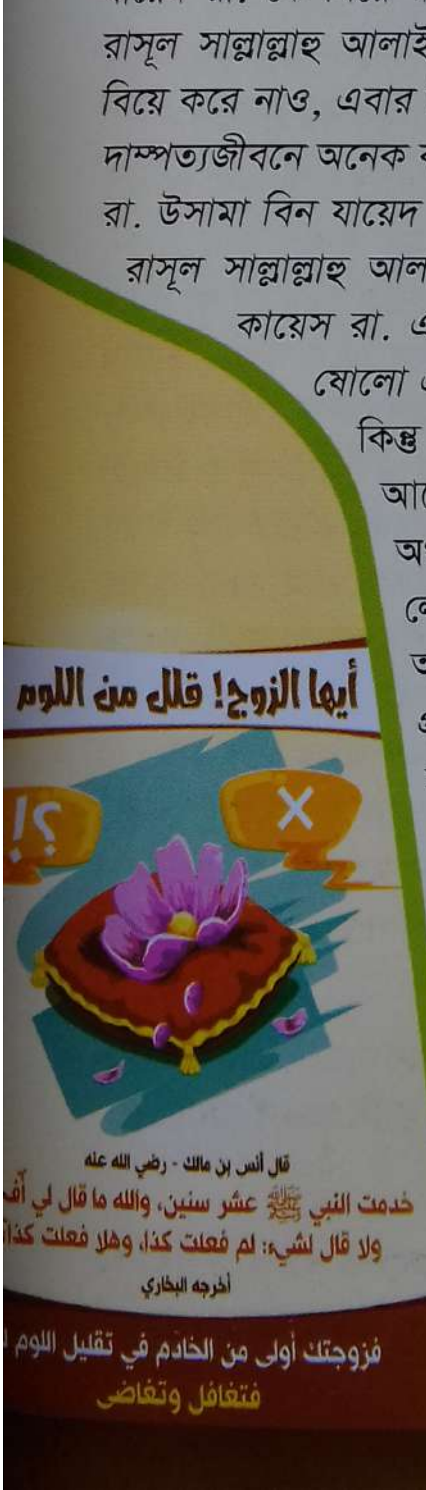

কিন্তু এ বয়সে তো সে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তার আয়ের কোনো উৎস থাকে না। হাতে থাকে না কোনো অর্থ-কড়ি। কমপক্ষে সে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ মানবসমাজের প্রচলিত অবস্থা আর নিয়মনীতি মানবস্বভাব ও বস্তুজগতের প্রকৃতির বিরোধী ও সাংঘর্ষিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আমরা এখন কী করব? যুবকরা কী করবে? সে তো বিয়ে ছাড়া অনড়াবস্থায় এই দশটা বছর কাটিয়ে দিতে বাধ্য। অথচ জৈবিক চাহিদা জীবনের এই দশ বছরেই সবচেয়ে বেশি আস্ফালিত ও অনুভূত হয়!

আল্লাহ তা'আলা তার দুই পার্শ্বের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি রেখে দিয়েছেন। যদি এই আগুন বিয়ের মাধ্যমে নির্বাপিত না করে, তা হলে এর তাপে হয়তো বা নিজে দগ্ধ হবে, অথবা ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। এখানেই হলো

মূল সমস্যা। এ নিয়েই আলোচনা করা দরকার।

যিনি এ বিষয়ে কলম ধরবেন, তার জন্য সবচেয়ে সহজ হলো, তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন এবং দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে বলবেন, 'আমার মতে বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলো ত্রিশ বছর।'

হ্যাঁ, এটা আপনার কেবলই একটা রায়। এ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। এটা একটা মাগনা কথা। যে বিচারক ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন, এখানে তার কষ্টক্লেশের কিছুই নেই। শুধু মুখ খুলবে ও জিহ্বা নাড়িয়ে একটা রায় দেবে। কিন্তু সব মুসিবত তো তার, যার ওপর ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয়। আর এখানে রায় ঘোষণা করা হচ্ছে যুবকের ওপর। তদ্রূপ যুবতীর ওপরও।

যখন যুবকের স্বভাব ও তার প্রকৃতি পনেরো বছর বয়সেই যৌনক্ষুধা জগিয়ে তোলে, আর আমাদের সম্মানিত চিন্তাবিদ ভাই তার মত প্রকাশ করে বলেন, 'ত্রিশের আগে বিয়ে করা যাবে না'- তা হলে বাকি পনেরো বছর সে কী করবে? বিশেষ করে ওই সমাজ, যে সমাজ তাকে এই বয়সে বিয়ে করতে নিষেধ করে। তার এই আগুনকে আরও প্রজ্বলিত করতে এমন কোনো মাধ্যম নেই, যে মাধ্যম সমাজ অবলম্বন করেনি। যখনই বেচারা এই যৌনক্ষুধা কিছুটা হলেও ভুলে যায়, তখনই আমরা তাকে সেই তাড়না স্মরণ করিয়ে দিই উলঙ্গ চিত্রাবলি, নগ্ন ফিল্ম, পথেঘাটে তরুণীদের অর্ধ-উলঙ্গ দেহ আর অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে। সে রাস্তায় হাঁটলেও শরীর প্রদর্শনকারিণী নারী দেখতে পায়। কলেজ-ভার্সিটিতে গেলেও সেথায় এসব নারী দেখতে পায়। সে সর্বত্রই এসব নারী দেখা পায়। আবার আমরা তার ওপর এই চাহিদার আগুনকে বুকের ভেতর পনেরো বছর জ্বালিয়ে রাখাকে অপরিহার্য করছি! আবার তাকে এ-ও বলছি যে, ক্লাসে যাও, অধ্যয়নে মনোযোগ দাও, আর খবরদার! অশ্লীল বিষয়ের মোটেও চিন্তা করতে পারবে না! মোটেও ধারেকাছে যেতে পারবে না!

আল্লাহর কসম করে বলছি, যে যুবককে পনেরো বছর কয়েদখানায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যুবক থেকে বেশি করুণ নয়।

তা হলে এখন কী করণীয়?

করণীয় একটাই। আর তা হলো আমরা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব ও প্রকৃতির দিকে ফিরে আসব। কারণ, মানুষ মানবস্বভাব ও বস্তুজগতের প্রকৃতির

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদাদের নিয়মের দিকে ফিরে যেতে হবে। সেই হিসাবে আমাদের যুবকের বিয়ে দিতে হবে আঠারো বছর বয়সে আর যুবতীর সতেরো বছর বয়সে।

যদি এটা সম্ভব না হয়, তা হলে কমপক্ষে আমাদের সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হবে। উন্নত চরিত্র ও আদর্শ নীতির ওপর লালন-পালন করতে হবে। সমাজ ও পরিবেশকে ওই সব নষ্টামি থেকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, যেসব নষ্টামি একজন যুবককে শত ভুলে থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাকে আরও স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সব ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচারকে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। মেয়েদের বাবারা ঠিক তদ্রূপ তাদের মেয়েদের হেফাজত করে রাখতে হবে, যদ্রূপ তারা তাদের সম্পদকে কারও হাতের নাগাল থেকে হেফাজত করে রাখে। যাতে করে কেউ তাদের মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।

এটিই জবাব। আমি আশা করি, যে ব্যক্তি আমার এই লেখাটি পড়বে, সে অবশ্যই বলবে, এটিই সঠিক। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কেউ আমলে নেবে না! *[সূত্র : মাআ'ন নাস, পৃষ্ঠা : ২০৩]*

আমার বিয়ে ও বধূ

আমি এমন কোনো পুরুষকে দেখিনি, যে দাম্পত্যজীবনে নিজেকে সুখী-সৌভাগ্যবান বলে দাবি করেছে! যতই সুখী-সৌভাগ্যবানই থাকুক না কেন, স্বীকার করতে কেন যেন আমতা আমতা করে! কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে নি'আমতের অকৃতজ্ঞ! নি'আমতের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারে না- নি'আমত দূরীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত। মানুষ লোভী হয়ে থাকে। কোনো নি'আমত পেলে তুষ্ট হয় না, তার আরও চাই! সে অল্পে তুষ্ট হয় না, তাই নি'আমতের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হয় না। এ জন্যই স্বামীরা সর্বদা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে অভিযোগ করে। তাদের কেউ তার অর্ধাঙ্গিনীর কোনো শুকরিয়া আদায় করে না যতক্ষণ না বেচারি মারা গেছে ও তার সাথে সম্পর্কের রজ্জু ছিঁড়েছে! যতক্ষণ না তার সাথে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পাঠ চুকেছে। কিন্তু যখনই বেচারি মারা যায়, বেচারির শুকরিয়া আদায় করতে শুরু করে! বেচারির গুণাগুণ বর্ণনা করতে শুরু করে!

আমি এখন আমার ওপর আল্লাহ তা'আলার নি'আমতের ফল্গুধারা বর্ণনা করতে ও তার করুণা স্বীকার করতে গিয়ে বলছি–

আমি আমার বিয়েতে সুখী-সৌভাগ্যবান। এই সুখ-সৌভাগ্যের ওপর আমাকে বেশ ক'টি বিষয় সাহায্য করেছে। আশা করি বিয়ে করতে ইচ্ছুক ও বিয়েপরবর্তী দাম্পত্যজীবনে সুখ-সৌভাগ্যের অন্বেষণকারী প্রত্যেক যুবক এই বিষয়গুলোর ওপর সামর্থ্য রাখবে। তাই প্রত্যেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেন আমার অভিজ্ঞতা হতে উপকার লাভ করে। রাস্তার ওপর চলাচলকারী ব্যক্তি থেকে যেন রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে জেনে নেয়, যে এখনো এই রাস্তা দিয়ে চলেনি।

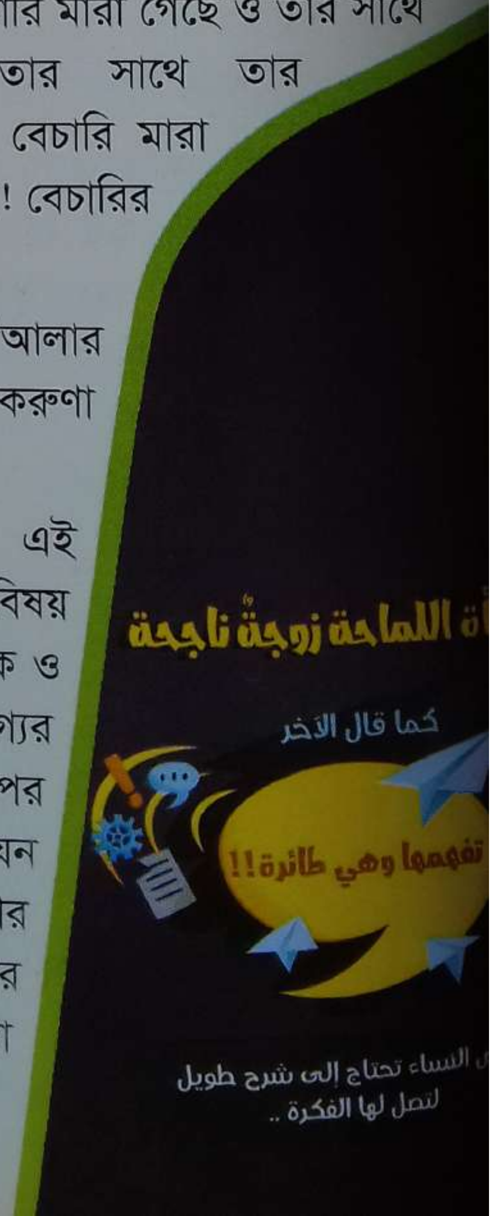

এক. আমি এমন কোনো অপরিচিত মানুষদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইনি, যাদের সাথে আমার পূর্বের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা আমাকে চেনে না আমিও তাদের চিনি না। যাতে করে তাদের সাথে মেলামেশার পর তাদের ব্যাপারে আগে যা শুনেছি, তার বরখেলাফ কিছু প্রকাশ না পায়। তাদের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ কোনো ত্রুটি দেখতে না পাই, যা আগে তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে অনুমান করতে পারিনি। বরং আমি আমার নিকটাত্মীয়দের থেকেই বিয়ে করেছি, যারা আমাকে চেনে এবং আমিও তাদের চিনি। ঘরের মধ্যে যাদের জীবনযাপন সম্পর্কে আমি অবগত হতে পেরেছি এবং তারাও ঘরের মধ্যে আমার জীবনযাপন সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পেরেছে। কেননা, অনেক পুরুষ এমন আছে, যার ব্যাপারে মানুষেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে খুবই রসিক- ভাঁড় টাইপের। সে মানুষের মধ্যে এতটাই সমাদৃত যে, সে না হলে মানুষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-আয়োজনের সৌন্দর্যই আসে না। আমার শাশুড়ি সিরিয়ার নামকরা আলেম, বড় মুহাদ্দিস শাইখ বদরুদ্দীন আল-হুসাইনী রহ.-এর কন্যা। মাতা-পিতা হিসাবে আমার স্ত্রী এক বনেদি পরিবারের সন্তান। বংশের গুণ তার মাঝে বিদ্যমান।

দুই. আমি আমার স্ত্রীকে সমাজের এমন এক শ্রেণি থেকে নির্বাচন করেছি, যে শ্রেণি আমাদের শ্রেণির মতো। আমার আব্বু আর শ্বশুর কোর্টের আপিল বিভাগে একই পদে চাকরি করতেন। সে হিসাবে তিনি একজন বিচারক। আর আমিও একজন বিচারক। তাদের জীবনযাপন, চালচলন প্রায় আমাদের মতোই। আর এই দিকটাই কিন্তু সুখময় দাম্পত্যজীবনের জন্য মজবুত ভিত্তিস্বরূপ। এ জন্যই হানাফী ফুকাহায়ে কেরামগণ বিয়েতে বর-কনের মধ্যে কুফু তথা সমকক্ষতার শর্তারোপ করেছেন। উল্লেখ্য, হানাফীদের ইসলামী শরী'য়তের বিজ্ঞানী বলা চলে।

তিন. আমি আমার স্ত্রীকে ততকালীন সময়ের প্রচলন অনুযায়ী শিক্ষিতা অবস্থায় বিয়ে করেছি।

অর্থাৎ আমার স্ত্রী ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করেছিল। সে কোনোকিছু পড়তে ও লিখতে পারত- এতটুকুই। সাধারণ মূর্খ, গ্রাম্য মেয়েদের মতো ছিল না। বর্তমানে সে আমার সাহচর্যে থেকে তেরো বছরে অনেক কিছু বুঝতে ও অনুধাবন করতে শিখেছে। বই-পুস্তক আর পত্র-পত্রিকা থেকে যা পড়ে, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। যা বর্তমানের সার্টিফিকেটধারিণী শিক্ষিতা মেয়েরাও বুঝতে সক্ষম হয় না। আমি এসব শিক্ষিতা মেয়েদের ভালোভাবে চিনি। আমি দু-বছর পূর্বে মহিলা ভার্সিটিতে স্নাতক বিভাগের ছাত্রীদের প্রফেসর ছিলাম। আমি তাদের কাউকেই আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশি অনুধাবনকারিণী পাইনি। যদিও তারা অনেক কিছুই মুখস্থ পারত। আমার স্ত্রী যে বস্তুর নামটাও কখনো শোনেনি, তারা তা মুখস্থ করতে পারত। আমি ছেলেদের শিক্ষিতা মেয়েদের বিবাহ করা থেকে অনীহা প্রদান করছি না। তবে আমি আফসোসের সাথে এটাই সাব্যস্ত করছি যে, বর্তমান প্রচলিত ভ্রান্তধারার শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুবতীদের চরিত্র ও স্বভাব নষ্ট করে দেয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা একজন মেয়ে থেকে অনেক কিছুই নেয়। অনেক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপত্তি। কিন্তু তাকে খোসা ছাড়া আর কিছুই দেয় না। যে খোসা তার জীবনে কোনো উপকার পৌঁছায় না। তাকে স্ত্রী ও জননী হিসাবে কোনো ফায়দা দেয় না। আর একজন নারী যতই উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে যাক না কেন, একজন সুখী স্ত্রী ও জননী হওয়ার চেয়ে তার জীবনে আর কোনো কিছু বড় হতে পারে না। *[শাইখ আলী তানতাবী রহ. বলেন, নারী যতই অর্থ-বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন করুক তার সবচেয়ে আরাধ্য বিষয়, সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু কারও সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। একজন পুণ্যবতী স্ত্রী হতে পারা তার জন্য অনেক বড় বিষয়। চাই সে গৃহিণী হোক বা না হোক। এ কথা সাধারণ ঘরকন্যাদের বেলায় যেমন সত্য রাজকুমারী, সম্রাজ্ঞী কিংবা হলিউড-বলিউডের তারকাদের বেলায়ও ঠিক তেমনই সত্য। আমি মিসর ও সিরিয়ার দুইজন সাহিত্যিকা নারী সম্পর্কে জানি। এটা ঠিক যে, তারা ভালো লেখেন। সাহিত্যসম্মান ও সম্পদ দুই-ই তারা কুড়িয়েছেন। তবে ব্যাপার হচ্ছে তারা স্বামীর সংসার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সাথে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও খুইয়েছেন। আমি তাদের নাম বলব না, কারণ তারা অনেক বেশি পরিচিত। নারীর সবচেয়ে আরাধ্য বিষয়ই কিন্তু দাম্পত্যজীবন। যদি সে পার্লামেন্টেরিয়ান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানও হয় তবুও। (ইয়া বিনতী, পৃষ্ঠা : ১৫)-অনুবাদক]*

চার. আমি বাহ্যিক সৌন্দর্য কখনো চাইনি। এটাকে কখনো বাধ্যতামূলক শর্ত সাব্যস্ত করিনি। যেমনটা জ্যোতিষশাস্ত্রবিদরা মনে করেন। কারণ, আমি জানি যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য অস্থায়ী। সুন্দরী মহিলার বাহ্যিক সৌন্দর্য লোপ না পেলেও কিন্তু তার প্রতি স্বামীর আগের সেই অনুভূতি থাকে না। থাকে না আবেগ-আসক্তি। এ জন্যই আমি অনেক স্বামীকে দেখতে পাই যে, তারা ঘরে সুন্দরী বউ রেখেও অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী নারীদের পিছু দৌঁড়ায়! এখান থেকেই ইবলিসের শরী'য়তে পাপিষ্ঠ কবিদের নেতা ফারাযদাকের স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালা খাপ খেয়েছে। একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্পে ফারাযদাক তার স্ত্রী 'নাওয়ার'-কে সম্বোধন করে বলেছিল–

-তুমি হারাম হলে কী উপাদেয়ই না হতে! তুমি হালাল হয়ে কী বিস্বাদ হয়ে আছো!

পাঁচ. এক যুগ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও আমার স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের সাথে এখন পর্যন্ত সম্পর্ক অটুট রয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক, পরস্পর ভালোবাসা, সম্মান, কিছুদিন পর পর সাক্ষাৎ। আমি তার পরিবারের কাউকে পাইনি যে, দুলাভাইদের তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি সমাধান করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে বলছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী মাঝেমধ্যে একে অপরের প্রতি মান-অভিমান আর রাগ-অনুরাগ করতাম। যেভাবে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী করে থাকে। কিন্তু আমার শ্বশুরালয়ের কেউ আমাদের খুশি করতে ও রাগ ভাঙাতে নাক গলাতে আসেনি। আজ পর্যন্ত আমি কোর্টে প্রায় বিশ হাজারের মতো দাম্পত্যজীবনের সমস্যাবলি সমাধান করেছি। এতে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে, আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, যদি দুই ঝগড়াটে স্বামী-স্ত্রীকে তাদের হালতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, এতে তাদের নিজেদের কোনো সন্তান বা পরিবারের কেউ নাক না গলায়, তা হলে অবশ্যই দাম্পত্যজীবনের চার ভাগের তিন ভাগ সমস্যা এমনিতেই মিটে যাবে।

ছয়. বেশির ভাগ দম্পতির মতো আমরা আমাদের বিয়ের শুরুলগ্ন মধুময় করিনি। অতঃপর সারা জীবন হয় শুধু তিক্ত ফল। ত্বরিতঘাতক বিষ। বরং বিয়ের পর শুরুর দিকে আমি তার সাথে যেমন-তেমন ব্যবহার করেছি। যখন সে বাধ্য হয়ে এগুলো মেনে নিয়েছে, পুণ্যের আশায় সবর করেছে, আমি তার সাথে আমার সুন্দর চরিত্র প্রদর্শন করতে শুরু করেছি। সুতরাং যত দিন

গড়াতে লাগল, তত আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হতে লাগল।

সাত. সে আমার ঘরে যৌতুক হিসাবে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আসেনি। অথচ এগুলো শর্তারোপ করা হয়েছিল। কেননা, আমি দেখেছি যে, যৌতুকের সামগ্রীই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের বড় কারণ। হয়তো স্বামী সেই সামগ্রীকে ব্যবহার করবে, এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে রেখে নিজেকে প্রাধান্য দেবে। তো এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বা স্বামী এগুলোকে চুরি করে ফেলবে অথবা লুকিয়ে নেবে- এই ভয়ে স্ত্রীর মন সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। অথবা স্ত্রী এগুলোকে আগলে আগলে রাখবে, তো এতে স্বামীর অন্তর হা-হুতাশ করবে!

আট. বাইবেলে একটি প্রবাদ আছে যে, 'কাইসারের জন্য যা আছে, তা কাইসারের জন্য রেখে দাও।' সেই হিসাবে আমি ঘর-দোর সাজানো ও সন্তানদের লালনপালনের বিষয়ে আমি তার সাথে নাক গলাতে যাইনি। এসব তার জন্য ছেড়ে দিয়েছি। আর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়াবলি সে আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছে, তাতে নাক গলায়নি। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মনোমালিন্যের কারণ হয়ে থাকে, স্ত্রী স্বামীর পাগড়ি পরে নেওয়া আর স্বামী স্ত্রীর ওড়না পরে নেওয়া আর ঘর-দোর ঝাড়ু দেওয়া ও বেগুনের টুকরো বা কাপড়ের অংশ কাটার ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে নাক গলানোকে কেন্দ্র করে।

নয়. আমি তার কাছে কোনো বিষয় লুকাইনি, সেও কোনো বিষয় আমার কাছ থেকে লুকায়নি। আমি তার সাথে কখনো মিথ্যা বলিনি, সেও আমার সাথে কখনো মিথ্যা বলেনি। আমি তাকে আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি। আমি কোথাও গেলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আর না হয় তাকে জানাই। সেও কোথায় যায় বা না যায়, আমাকে জানায়। আমাদের দেখাদেখি চার মেয়েও সততা ও স্পষ্টভাষিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে! মিথ্যা ও কপটতাকে তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে করতে বড় হয়েছে!

আল্লাহর কসম! আমি তার মধ্যে যে একনিষ্ঠতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ফিকির পাই, তার চেয়ে বেশি কিছু চাই না। সে প্রাচ্যের সেসব নারীদের মতোই, যারা সংসার অন্তঃপ্রাণা। নিজেকে ভুলে যায় সংসারের জন্য। স্বামী-সন্তানের জন্য না খেয়ে বসে থাকে, যাতে আমরা খাই! রাত্রিজাগরণ করে, যাতে আমরা ঘুমাই! নিজে কষ্ট করে, যাতে আমরা আরামবোধ করি! নিজেকে বিলিয়ে দেয়, যাতে আমরা বেঁচে থাকি! সে সবার আগে জাগে, সবার শেষে ঘুমোতে যায়! সারাক্ষণই কিছু না-কিছু করছেই! ঝাঁড়ু দিচ্ছে। সেলাই করছে। দৌড়ঝাঁপ করছে। ঘর-দোর সামলাচ্ছে। তার একটাই কাজ- আমাকে সুখ দেওয়া। আমাকে সৌভাগ্যবান করা।

যদি আমি লিখতে থাকি বা ঘুমাই, তো সন্তানদের চুপ করাচ্ছে। পুরো ঘরকে ঠান্ডা রাখছে। আমার থেকে প্রত্যেক কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক বস্তু দূরে রাখছে।

আমি যাকে ভালোবাসি, সে-ও তাকে ভালোবাসে। আমি যাকে অপছন্দ করি, সে-ও তাকে অপছন্দ করে। গহনা-অলংকারের প্রতি নারীদের সহজাত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে এটা ছিল না। যদিও নারীদের বেশির ভাগ কামনা হয় কাপড়-চোপড় আর অলংকার-গহনা, কিন্তু সে চাইত আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি হোক! ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে উঠি!

সে আমার পরিবারকে ভালোবাসে। কিসে তাদের ভালো হবে, সে চিন্তায় বিভোর থাকে। আমি কখনো পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর রাখতে না পারলেও, সে ঠিকই আমার হয়ে দায়িত্ব পালন করে। আমি পরিবার-পরিজনের প্রতি কৃতকর্তব্য ভুলে গেলে, সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি একবার আমি চেয়েছিলাম যে, তার ও আমার বোনের মাঝে কিছুটা বিবাদ হোক, যাতে আমি সান্ত্বনা দিতে পারি। কিন্তু আমি তাদের উভয়ের থেকেই কেবল ভালোবাসা, সৌহার্দ, একনিষ্ঠতা আর আন্তরিকতা দেখতে পেয়েছি।

সে একজন আরব মুসলিম মহিলার পরিপূর্ণ নমুনা। স্বামী-সন্তানই যার একমাত্র জগৎ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অনেক যুবককে দেখেছি, ইউরোপ বা আমেরিকায় গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছে! হাতে কাগজের একটা সার্টিফিকেট আর বগলে মেম নিয়ে নামছে।

তারা মেম নিয়ে এসে অর্ধপৃথিবী ঘুরে বেড়ায় বা তিন ভাগের এক ভাগ কিংবা চার ভাগের এক ভাগ। অতঃপর তাদের আনীত মেমের চামড়ার সৌন্দর্য থাকে না। থাকে না কোনো ভদ্রতা। তারা আমাদের আরব মহিলাদের চাকরানি হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। এটা বিকৃত রুচি। জ্ঞান-বুদ্ধির লোপ। হীনদের আদর্শ হিসাবে মানা। সবলের দুর্বলকে অনুসরণ করা।

একজন যুবক মনে করে যে, যদি সে আমেরিকান কিংবা ইউরোপিয়ান সাদা চামড়ার কোনো মেমকে বিয়ে করতে পারে বা সিনেমার পর্দায় অভিনেত্রী কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে বা অভিজাত হোটেলের অফিসে চাকরিজীবী কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, তা হলে সে অনেক বড় কেল্লাফতে করে ফেলেছে! গগনচুম্বী অট্টালিকার মালিক বনে গেছে! স্বাধীনতার ভাস্কর্যে তার নাম খোদাই করে লিপিবদ্ধ করে!

আমাদের মুসলিম নারীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী। তারা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। সন্তানের প্রতি মমতময়ী থাকে। নিজের ইজ্জত-আব্রুর প্রতি সংবেদনশীল থাকে। সতী-সাধ্বী হয়। স্বামীর আদেশ-নিষেধের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীলা থাকে।

আমি আমার স্ত্রীর কতিপয় বৈশিষ্টাবলি এ জন্যই বললাম যে, যাতে আমি উদাহরণ দিতে পারি সেই সৌভাগ্যের, যে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকে আরব মহিলার একজন পতি। চাইলে আমি বিশেষ করে সিরিয়ান মহিলা বলতে পারতাম। এই কথাগুলো বলার কারণ, যাতে আল্লাহ তা'আলা পাঠক অনূঢ় যুবকদের অন্তরে বিয়ের আগ্রহ ঢেলে দেন। যদি তা-ই হয়, তা হলে আল্লাহ তাকে আমার মাধ্যমে হেদায়েত দান করলেন, আমাকে হেদায়েত দান করার পর।

সমাপ্ত

ড. আলী তানতাবীর পরিচিতি

বিংশ শতাব্দিতে যে সকল আরব মনীষী তাদের কলম আর যবানের মাধ্যমে দাওয়াতের ময়দানে বিশাল বড় অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম হলেন শায়েখ আলী বিন মুস্তফা আত-তানতাবী।

সংক্ষেপে তিনি আলী তানতাবী নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯০৯ সালে সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শায়েখ মুস্তফা তানতাবি ছিলেন সিরিয়ার একজন নামকরা আলেম। দামেস্কের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পিত ছিল। তার মায়ের বংশও ছিল অত্যন্ত খ্যাতিমান ও অভিজাত।

ষোল বছর বয়সেই তাঁর পিতা মারা যান। পরিবারে তখন তাঁর মা এবং তারা পাঁচ ভাইবোন। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার মানসে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার দয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং পুনরায় পড়াশোনায় মন দেন।

১৯৩১ সালে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু। সেসময় তিনি 'আল আইয়াম' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সত্য কথনের দায়ে তৎকালীন সরকার সেটি বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি সিরিয়াতেই শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত থাকেন। সত্যবাদিতা আর সৎসাহসের জন্য এই সময় তাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়।

ড. আলী তানতাবীকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ লেখনী শক্তি দান করেছিলেন। যতোদিন বেঁচে ছিলেন দু'হাতে লিখে গিয়েছেন। তার প্রায় সব লেখাই প্রথমে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সেগুলোকে সংকলিত করে গ্রন্থের আকার দেওয়া হয়।

শেষ বয়সে আলী তানতাবী শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। হাসপাতাল আর বাসায় অনেক বেশি দৌঁড়াদৌড়ি করতে হয় তাকে। মৃত্যুর বছর যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৯৯ সাল ১৪ রোজ শুক্রবার এই মহা মনীষী জেদ্দার বাদশা ফাহাদ হাসপাতালে পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে পরকালের অনন্ত পথে পাড়ি জমান। পরের দিন মসজিদুল হারামে জানাযা শেষে মক্কাতুল মুকাররমার কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে– 'অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো, শুধু ঢের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করোনা'। অভিজ্ঞতা ব্যতিত শুধু ঢের জ্ঞান কোন কাজে আসেনা। ঢের জ্ঞান তখনই কাজে আসে, যখন সাথে অভিজ্ঞতাটাও থাকে। হাঁ, মুসলিম সমাজে বিয়ে, বিয়ের প্রতিবন্ধকতা, বিয়ে পূর্ববর্তী কথিত প্রেম-ভালবাসা, বিয়ে পরবর্তী দাম্পত্যজীবনকে ঘিরে নানা জটিলতা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বিচারপতি শাইখ আলী তানতাবী রহ. হলেন ঢের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি; যিনি দামেশকের শরীয়াকোর্টে প্রায় বিশ হাজারের মত বৈবাহিক জটিলতার সমাধান করেছেন। দামেশকের শরীয়াকোর্টে মামলা-মুকদ্দমার সূত্রে প্রতিদিন জড়ো হত শত শত ঝগড়াকারী দম্পতি। শাইখ আলী তানতাবী রহ. সেখানে তাদের উভয় পক্ষের মৌখিক জবানবন্দি শুনতেন অতঃপর ইসলামি শরী'আহর আলোকে বিচার করতেন। এভাবে বিচার করতে করতে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটা একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে তিনি ছিলেন এ বিষয়ে একজন উচুঁমাপের গবেষক ও শাস্ত্রীক ব্যক্তি। আর তাইতো তিনি মুসলিম সমাজে বিয়ের প্রতিবন্ধকতা ও বৈবাহিক জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি গবেষণাধর্মী অফিস খুলতে চেয়েছিলেন। যদিও তা সময়ের অভাবে আর হয়ে উঠেনি।

মানব জীবন সার্থক হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি এই 'বিয়ে'-কে একটি ইবাদত ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার হাতিয়ার না বানিয়ে তাকে ব্যবসার লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যম ও বাণিজ্যের উপকরণ বানিয়ে নেয়ার দ্বারা মুসলিম সমাজে 'বিয়ে'-র পথে যে প্রতিবন্ধকতা ও বৈবাহিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে যে ব্যভিচার-দুরাচার ও আইবুড়োত্বের হার ক্রমশ বাড়ছে- তা দেখে শাইখ আলী তানতাবী বিবেকের দংশনে দংশিত হয়ে এ ব্যাপারে কলম উঠিয়েছিলেন সে অনেক আগেই। তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাবে 'বিয়ে' নিয়ে বেশ কয়েকটা অমূল্য রচনা লিখে গেছেন। রচনাগুলিতে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা কলমের ডগা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালি দিয়ে এঁকে দিয়েছেন এর চিরন্তন প্রতিকার। প্রতিটি কথা তার হীরা-মণি-মুক্তার মত। মুসলিম সমাজের কর্ণধারদের বিবেকের বদ্ধ দোয়ারে সজোরে করাঘাত করার মত। বক্ষমান গ্রন্থটি সেসকল রচনারই অনুবাদ সমষ্টি।

অনূদিত এই গ্রন্থটি যৌবন তাড়নায় উপায়ান্তর না পাওয়া আড়ষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় যুবক-যুবতী, বংশের মুখে চুনকালি লেপনকারী বেপরোয়া ছেলে-মেয়ের জন্মদাতা উদাসী জনক-জননী, ঘরে ঘরে বিয়েবিলম্বিতা আইবুড়ো মেয়েদের নিয়ে নির্ঘুম রাত যাপনকারী মাতা-পিতার প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও করণীয় ঠিক করার এক চিরসত্য ব্যবস্থাপত্র।

হুদহুদ প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

987-984-871-192

design: print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389